প্রবা প্রকাশনী

রকিব হাসানের

শিকার-১

টেম্পল টাইগার

জিম করবেট

দি সঙ্গম প্যানথার

কেনেথ এণ্ডারসন

ও অন্যান্য কাহিনী অবলম্বনে

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2011.01.30 00:16:03 +06'00'

www.boiRboi.blogspot.com

সূচী

মন্দিরের বাঘ—৭
সঙ্গম-চিতা—৫৪
পানারের মানুষখেকো—৯৪
মানুষখেকো চিতা—১৩১
তল্লাদেশের মানুষখেকো—১৬২

মন্দিরের বাঘ

দাবিধুরার দেবগিরি পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট সুন্দর রেস্ট হাউসটি। তিন ঘরের এই বাড়িটির বারান্দা থেকে পাহাড়টা এখানে খাড়া নেমে গেছে পানার নদীর উপত্যকা পর্যন্ত। উপত্যকার ওপার থেকে ধাপে ধাপে আবার উঠে গেছে চিরতুষারাবৃত অঞ্চলের দিকে।

কুমায়ুনের প্রশাসনিক সদর দপ্তর নৈনিতাল থেকে পুব সীমান্তের মহকুমা শহর লোহারঘাট পর্যন্ত রাস্তাটা দাবিধুরার ওপর দিয়েই গেছে, আর এ রাস্তা থেকেই একটা শাখাপথ বেরিয়ে যুক্ত করেছে আলমোড়া আর দাবিধুরাকে। এই শাখাপথটা ধরেই পানারের এক ভয়ঙ্কর মানুষখেকো চিতাকে মারার জন্যে রওনা দিয়েছিলেন একদিন বিখ্যাত শিকারী জিম করবেট। আর ওই চিতা মারতে গিয়েই এক অদ্ভুত বাঘের সাক্ষাৎ পান তিনি।

এপ্রিলের এক উত্তপ্ত বিকেলে ওই এলাকার দুর্গমতম

পথ বেয়ে আট হাজার ফুট উঁচু পর্বত চূড়ায় উঠে দাবিধুরা রেস্ট হাউসে এসে পৌঁছুলেন জিম করবেট। রেস্ট হাউসের বারান্দায় বসে কাপের পর কাপ চা পান করতে করতে প্রকৃতির অপূর্ব শোভা নিরীক্ষণ করছিলেন তিনি, এমন সময় তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থী হিসেবে এসে হাজির হলেন দাবিধুরা মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত। রেস্ট হাউস থেকে অল্প দূরে আর একটি পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত দাবিধুরা মন্দির। হিন্দুদের তীর্থস্থান হিসেবে বহুল পরিচিত ওই মন্দিরটি কে, কখন, কি উদ্দেশ্যে এত দুর্গম জায়গায় নির্মাণ করেছিলেন, তা আজ আর নিশ্চয় করে বলতে পারে না কেউ। এই মন্দিরেরই তখনকার বৃদ্ধ পুরোহিতের সাথে যথেষ্ট হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল করবেটের। তিনি ওই এলাকায় গেলেই তাঁর সাথে এসে দেখা করতেন পুরোহিত। সহজ সরল ওই মানুষটিকে খুবই ভাল লাগত করবেটের।

সেদিন বিকেলে রেস্ট হাউসে এসে করবেটকে নমস্কার জানিয়ে পাশেই বসলেন পুরোহিত। চা আর সিগারেট খেতে খেতে এটা-ওটা নানান কথা আলোচনা চলল দু'জনের মধ্যে। তারপর স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ল বাঘের কথা। করবেট জানতে চাইলেন, 'এ এলাকায় মানুষখেকো চিতাটা ছাড়া আর কোন বাঘ আছে নাকি, ঠাকুর?'

'আছে,' মৃদু হেসে জানালেন ঠাকুর, 'কিন্তু ও বাঘ আপনি মারতে পারবেন না, সাহেব।'

'কেন?' একটু অবাক্ হয়েই জিজ্ঞেস করলেন করবেট।

'কারণ ও বাঘ মন্দিরের আশ্রিত। মা-স্বয়ং দেখাশোনা করেন ওর।'

'তাই নাকি?' করবেটের কথার ভাবে প্রচ্ছন্ন পরিহাস। 'তাহলে তো ও বাঘ আমাকে মারতেই হবে, ঠাকুর।'

'চেষ্টা করে দেখতে পারেন।' করবেটের পরিহাসে বিন্দুমাত্র মলিন হল না পুরোহিতের চেহারা। 'তবে, আবারও বলছি, ও বাঘ মারতে পারবেন না আপনি। আর শুধু আপনি কেন, কোন শিকারীই পারবে-না।' বলে উঠে দাঁড়ালেন পুরোহিত। 'আজ আসি। আবার দেখা হবে। নমস্কার।' ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলেন পুরোহিত। বারান্দা পেরিয়ে পাহাড় কেটে তৈরি করা ধাপ বেয়ে নেমে চলে গেলেন তিনি। তাঁর গমন পথের দিকে চেয়ে ভাবতে ভাবতে মনস্থির করে ফেললেন করবেট—যে ভাবেই হোক ওই 'মন্দিরের আশ্রিত' বাঘটাকে মারবেনই তিনি।

*

তার পরদিন মাস কয়েক আগে কোলকাতার ম্যাটনের দোকান থেকে কেনা ওয়েস্টলি রিচার্ডস্ কোম্পানীর '২৭৫ নতুন মডেল রাইফেলটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন করবেট। উদ্দেশ্য, মানুষখেকো চিতাটার খোঁজ-খবর নেয়া। কায়দা মত পেলে এক আধটা জারাও-ও (শম্বর হরিণের পাহাড়ী নাম) শিকার করা যাবে। দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়েই একজন স্থানীয় পথ প্রদর্শককে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। তীক্ষ্ণ নজরে চারদিক দেখতে দেখতে পথ চলছিলেন করবেট।

দাবিধুরা পাহাড়ের খাড়াই উত্তরের তুলনায় অনেক কম, কাজেই পথ চলতে খুব একটা কষ্ট হল না তাঁদের। ওক বন আর ঝোপ জঙ্গল পেরিয়ে প্রায় দু'মাইল পথ হেঁটে একটুকরো ঘাসভূমিতে এসে পৌঁছুলেন তাঁরা, এখান থেকে অদূরের দিগন্ত বিস্তৃত উপত্যকাটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। উপত্যকার বাঁ দিকে ঘন ঝোপঝাড়ের পর আর একটুকরো ঘাসভূমি। ওই জায়গাটা দেখিয়ে পথ-প্রদর্শক জানাল করবেটকে, ওখানেই নাকি চরতে আসে জারাও। এ ছাড়াও উপত্যকার দক্ষিণের পথটার আশপাশেও জারাও-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এখান থেকে দু'টো জায়গারই দূরত্ব বড়জোর তিনশ গজ। আর করবেটের সঙ্গে আনা রাইফেলটি দিয়ে পাঁচশো গজ দূরের শিকারকেও স্বচ্ছন্দে মাটিতে ফেলে দেয়া যায়। সুতরাং এখানেই কোথাও জারাও-এর জন্যে ওত পেতে বসে থাকবেন স্থির করলেন করবেট।

ঠিক এই সময় বাঁ দিকের আকাশে কয়েকটা শকুনকে পাক খেয়ে খেয়ে উড়তে দেখলেন করবেট। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। সাধারণত মড়ি দেখতে পেলেই ওভাবে ওড়ে শকুনেরা। কৌতূহল হল করবেটের। সাথের লোকটির সাথে পরামর্শ করে ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখাই ঠিক করলেন তিনি।

খাড়াই বেয়ে নেমে এসে ছোট্ট একটা গ্রামে পৌঁছুলেন তাঁরা। একটা ঘাসে ছাওয়া ঘর, একটা গরুর বাথান আর পাহাড় কেটে তৈরি বিঘা তিনেক জমি। এই নিয়ে হল

'গ্রাম'। দেখেই বোঝা গেল সদ্য কাটা হয়েছে জমির ফসল। কুঁড়ে ঘরটার পাশ দিয়েই বয়ে গেছে ফুট দশেক চওড়া একটা পাহাড়ী নালা। বর্ষাকালে বৃষ্টির পানিতে ভরে যায়, বর্ষা চলে গেলেই আবার শুকিয়ে যায় নালাটা। এই নালার ওপারে একটা পোড়ো জমিতে পড়ে থাকা একটা চামড়া ছাড়ানো মৃত জানোয়ারের গা থেকে মাংস খুবলে খাচ্ছে শকুনের দল।

করবেট আর তাঁর পথ-প্রদর্শক কুঁড়ের কাছে পৌঁছতেই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। নমস্কার করে জানতে চাইল, তাঁরা কে, কোত্থেকে আসছেন। নিজের পরিচয় দিয়ে করবেট বললেন, 'মানুষখেকো চিতাটাকে মারার জন্যে নৈনিতাল থেকে গতকাল দাবিধুরায় এসেছি আমি। আজও সেটার খোঁজেই বেরিয়েছি।'

দুঃখ করে বলল লোকটা, 'ইশ্, আপনি এসেছেন, এ কথা আগে জানলে একটা দারুণ খবর দিতে পারতাম আমি আপনাকে। না, না, চিতাটা নয়, এক বিশাল বাঘের খবর।'

'বাঘ?'

'হ্যাঁ, সাহেব, বাঘ।' আঙুল তুলে অদূরের শকুনে খাওয়া জানোয়ারটার দিকে নির্দেশ করে বলল লোকটা, 'ওই যে দেখছেন গরুটা, ওটা আমারই ছিল। গতকাল বাঘে মেরেছে।' একটু থেমে আবার বলল লোকটা, 'গত-কাল ওইখানেই চরছিল আমার পনেরটা গরু। হঠাৎ

ওপাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে গরুটাকে মেরে ফেলল বাঘ। আমার কাছে বন্দুক নেই, তাই হৈ চৈ করে আর ঢিল ছুঁড়ে বাঘটাকে তাড়িয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারলাম না। খোঁজ পেয়ে ঘণ্টা দুই আগে মুচি এসে গরুটার চামড়া ছিলে নিয়ে গেছে।'

'তা বাঘ আছে জেনেও এভাবে গরুগুলোকে ওখানে চরতে ছেড়ে দিয়েছিলে কেন?' জিজ্ঞেস করলেন করবেট।

'বাঘ তো এ এলাকায় বরাবরই আছে, সাহেব। কিন্তু এর আগে তারা কখনও গরু মোষকে আক্রমণ করেনি। এ হতচ্ছাড়া বাঘটা যে কোত্থেকে এলো!'

আর কোন কথা না বলে করবেট চলার উপক্রম করতেই জিজ্ঞেস করল লোকটি, 'চলে যাচ্ছেন, সাহেব?'

'হ্যাঁ। উপত্যকার ওখানটায় নাকি জারাও আসে, দেখি মারা যায় কিনা এক আধটাকে।'

'কিন্তু, সাহেব। আজ জারাও না মারলেই নয়?'

'কেন?'

'দেখতেই পাচ্ছেন, আমার জমির পরিমাণ নগণ্য। তা-ছাড়া তেমন উর্বরও নয়। একমাত্র ভরসা দুধেল গরুগুলোও যদি বাঘের হাতে মারা পড়ে তো পরিবার পরিজন নিয়ে না খেয়ে মারা পড়ব।'

'কি বলতে চাইছ?'

'হুজুর যদি দয়া করে বাঘটাকে মেরে দেন···।'

'হুঁহ।' ভাবতে লাগলেন করবেট। ঠিক এই সময়

পানি ভর্তি কলস নিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠে এল একজন মেয়েলোক, পেছনে একটা অল্পবয়সী মেয়ে আর একটা ছেলে। মেয়েটার মাথায় এক বোঝা সবুজ কাঁচা ঘাস আর ছেলেটার মাথায় এক আঁটি শুকনো ডালপালা। বুঝলেন করবেট, বিঘা তিনেক অনুর্বর জমি আর কয়েকটা পাহাড়ী গরুর (এই পাহাড়ী গরুগুলো দুধ দেয় খুবই কম, আর সেই দুধ দাবিধুরা বাজারে অত্যন্ত অল্প দামেই বিক্রি হতো তখন) ওপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে চারজন লোক। গরুগুলো মারা পড়লে সত্যিই অত্যন্ত বিপদে পড়বে লোকটি। সুতরাং বাঘ মারতে রাজী হয়ে গেলেন তিনি।

মড়িটাকে তখন প্রায় শেষ করে এনেছে শকুনগুলো। কিন্তু তাতে তেমন কোন ক্ষতি নেই। কারণ মড়িটার আশ-পাশে এমন কোন ঝোপঝাড় নেই যার আড়ালে লুকিয়ে বসে থেকে শকুনগুলোর কাণ্ড দেখতে পারে বাঘটা। সুতরাং রাতের বেলায় তার মড়ির কাছে ফিরে আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

কোথায় বসে বাঘের অপেক্ষা করা যায়. খুঁজতে চললেন করবেট। মড়িটা যেখানে পড়ে আছে তার আশপাশে বেশ খানিকদূর পর্যন্ত চড়ে বসার মত কোন গাছ নেই। সুতরাং কোন্ পথে বাঘটার ফিরে আসার সম্ভাবনা বেশি, তাই খুঁজতে শুরু করলেন তিনি।

পাহাড়ের এদিকে সেদিকে গরু বাছুর চলাচলের কয়েকটা

সরু পথ আছে। কিন্তু তার মাটি এত শক্ত যে কোন জন্তু জানোয়ারের পায়ের ছাপ পড়ে না সে-পথে। ছোট্ট গ্রামটা বার দু'য়েক প্রদক্ষিণ করে দেখে নিয়ে নালাটা ধরে এগোলেন করবেট। এখানকার নরম ভেজা মাটিতেই একটা বিরাট বাঘের পায়ের ছাপ আবিষ্কার করলেন তিনি। ছাপ দেখেই বোঝা গেল এ পথেই পাহাড়ের ওপরের দিকে উঠে গেছে বাঘটা, সুতরাং যদ্দূর সম্ভব এ পথেই ফিরবে সে। নালাটার যে পাড়ে কুঁড়েটা, সে-পাড়েই কুঁড়ে থেকে প্রায় তিরিশ গজ দূরে একটা সর্বাঙ্গে কাঁটা-গোলাপের লতায় ছাওয়া ওক গাছ। নালার দিকে ঝুঁকে আছে গাছটা। এগিয়ে গিয়ে রাইফেলটা মাটিতে রেখে গাছে উঠে পড়লেন করবেট। গাছের ওপরে লতায় ছাওয়া বসার মত মোটা-মুটি একটা সুবিধেজনক জায়গা দেখে নিয়ে আবার নেমে এলেন গাছ থেকে।

কুঁড়েয় ফিরে অপেক্ষমান কুঁড়ের মালিক আর পথপ্রদর্শক-কে উদ্দেশ্য করে করবেট জানালেন, উন্নতমানের বারুদ ঠাসা কার্তুজ ব্যবহারোপযোগী তাঁর ভারি দো-নলা '৫০০ এক্স-প্রেস রাইফেলটা আনতে রেস্ট হাউসে ফিরে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু পথপ্রদর্শক লোকটি করবেটকে বিরত করে বলল, 'সাহেবের আর কষ্ট করে কাজ নেই, আমিই গিয়ে নিয়ে আসছি বন্দুকটা।' বলে দ্রুত পায়ে চলে গেল সে।

বসে বসে কুঁড়ের মালিকের সাথে আলাপ জমালেন করবেট। এটা-ওটা বহু কথা জিজ্ঞেস করে করে জানতে

পারলেন, প্রকৃতি আর বুনো জানোয়ারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কি করে বেঁচে আছে একজন অতি দরিদ্র লোক। তাকে জিজ্ঞেস করলেন করবেট, 'কিন্তু এই জায়গা ছেড়ে অন্য কোন সুবিধেজনক জায়গায় গিয়ে বসবাস করলেই তো পার তুমি?'

উত্তরে সৈয়দ মুজতবা আলীর বিশালদেহী সেই বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতই জবাব দিল লোকটি, 'তা কি করে হয়, সাহেব? এটাই যে আমার ঘর।'

বিকেল গড়িয়ে যাবার পর বালা সিংকে (করবেটের অত্যন্ত প্রিয় এক গাড়োয়ালী যুবক। পরে অত্যন্ত রহস্যময় আর বেদনাদায়ক ভাবে মৃত্যু ঘটেছিল তার) সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল পথপ্রদর্শক। কারও হাতেই করবেটের আকাঙ্ক্ষিত রাইফেলটি নেই। বালা সিং-এর হাতে একটি লণ্ঠন। দ্রুত পায়ে করবেটের কাছে এসে জানাল বালা সিং, রাইফেলটা আনেনি সে, কারণ কার্তুজগুলো করবেটের সুটকেসে তালা-বদ্ধ আছে। আর চাবিটা রয়েছে করবেটের পকেটে। অত-এব সাথের নতুন রাইফেলটা দিয়েই বাঘ মারা ছাড়া উপায় নেই। এতে অবশ্য ক্ষতি নেই, তাছাড়া, মন্দ কি, বাঘ দিয়েই শিকার শুরু হবে রাইফেলটার।

গাছে উঠে বসার আগে ভালমত নির্দেশ দিলেন করবেট কুঁড়ের মালিককে, সে যেন তার দুই ছেলেমেয়েকে যতক্ষণ না তিনি বাঘ মারতে পারছেন ততক্ষণ চুপ করিয়ে রাখে, এবং তার বউও যেন ওই সময়ে রান্না করতে না বসে।

বালা সিংকেও কুঁড়ের লোকদের চুপ করিয়ে রাখার নির্দেশ দিলেন। আরও বললেন, তিনি শিস্ দিলেই যেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে অপেক্ষা করে সে।

সবাই গিয়ে কুঁড়েয় ঢুকতেই গাছে চড়ে বসলেন করবেট। পাহাড়ের ওপর থেকে অস্তগামী সূর্যের লাল আভা মিলিয়ে যেতেই কমে এল উপত্যকার পাখীদের কাকলী কূজন। অন্ধকার ঘন হয়ে আসতেই ওদিকের পাহাড়ের চূড়া থেকে ভেসে এল হুভুম্ প্যাঁচার কর্কশ চিৎকার। চাঁদ উঠতে দেরি আছে। সুতরাং আরও কিছুক্ষণ অন্ধকারে ঢেকে থাকবে চারপাশের বন-জঙ্গল-পাহাড়।

কবরের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে এখন আশপাশের এলাকা জুড়ে। কোন পাখী বা জানোয়ারও ডাকছে না এখন আর। অর্থাৎ আসছে বাঘ।

রাইফেলটা শক্ত করে চেপে ধরে অপেক্ষা করতে থাকলেন করবেট। হঠাৎ মড়িটার কাছ থেকে বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জন কানে পৌঁছল তাঁর। তার মড়ি খেয়ে যাওয়ায় শকুনদের যেন অভিশাপ দিচ্ছে বাঘ। কিন্তু এল কোন্ পথে বাঘটা? নালাটা ধরে আসেনি সে, তাহলে তাঁর চোখে পড়তোই। বোধহয় পাহাড় ঘুরে এসেছে। কিন্তু সহজ পথ ছেড়ে অত কঠিন ঘুরপথে আসতে গেল কেন বাঘটা? ভেবে একটু অবাকই হলেন করবেট।

মিনিট তিন-চারেক চাপা গলায় তর্জন গর্জন করে থেমে গেল বাঘটা। পাহাড়ের ওপারে তখন আলো ফুটতে শুরু

করেছে। কয়েক মিনিট পরই আশপাশের পাহাড়-জঙ্গল-উপত্যকা আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে পাহাড়ের ওপাশ থেকে উঠে এল চাঁদ। শকুনদের চেটে পুটে খেয়ে যাওয়া মড়িটার হাড়গুলো চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন করবেট। কিন্তু ওগুলোর আশপাশে কোথাও নেই বাঘটা। আশ্চর্য! গেল কোথায় ওটা?

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে জিভ দিয়ে উত্তেজনায় শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে চাপা শিস দিলেন করবেট। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কুঁড়ের ঘাসের বেড়ার ফাঁক দিয়ে আসা আলোর রশ্মি চোখে পড়ল তাঁর। করবেটের শিস শোনা মাত্র লণ্ঠন জ্বালিয়ে কুঁড়ের দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল বালা সিং। অপেক্ষা করতে থাকল পরবর্তী নির্দেশের।

হঠাৎ নিচে নালার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন করবেট। তাঁর গাছের ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে ডান কাঁধের ওপর দিয়ে বালা সিং-এর দিকে তাকিয়ে আছে বাঘটা। করবেটের রাইফেলের নলের মুখ থেকে বাঘটার দূরত্ব বড়জোর পাঁচ ফুট। বাঘটার ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর সই হয়েই আছে রাইফেলের মুখটা। শুধু ট্রিগার টেপার অপেক্ষা। বাঁটটাকে আরো শক্ত করে চেপে ধরে আলতো করে ট্রিগারে চাপ দিলেন করবেট। ট্রিগার নেমে এল, কিন্তু কাজ করল না রাইফেলের মেকানিজম।

ঢকিতে কথাটা মনে পড়ে গেল করবেটের। রাইফেলটা

নতুন মডেলের। গুলি করতে হলে দু'বার বোল্ট টানতে হয় ওটার। অথচ পুরনো অভ্যাসবশতঃ বোল্টটা মাত্র একবার টেনেই বাঘের জন্যে তৈরি হয়ে বসে ছিলেন তিনি।

অতি সাবধানে করবেট আরেকবার বোল্টটাকে টানতে যেতেই ক্লিক করে মৃদু একটা ধাতব শব্দ হল। কিন্তু ওইটুকু আওয়াজই বাঘের অসাধারণ তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তির পক্ষে যথেষ্ট। একলাফে নালা পেরিয়ে ওপারে চলে গেল সে, তারপর করবেট গুলি করার আগেই ছুটে পাহাড়ের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। অগত্যা গাছ থেকে নেমে কুঁড়ের দিকে এগিয়ে চললেন তিনি।

করবেটের মুখ থেকে সব কথা শুনে দুঃখ করে বালা সিং বলল, তার ভুলের জন্যেই এমনটি ঘটল। সে যদি বুদ্ধি করে কার্তুজ-শুদ্ধ সুটকেসটা বয়ে নিয়ে আসত তা-হলেই কার্তুজগুলো বের করে নিতে পারতেন করবেট।

কিন্তু তাঁর বহু ব্যবহৃত পুরোনো এক্সপ্রেস রাইফেলটি হাতে পেলেও সেদিন করবেট সেই আশ্চর্য বাঘটিকে মারতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

*

পরদিন সকালে মানুষখেকো চিতাটার সন্ধানে আবার বেরোলেন করবেট। দুপুর পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েও চিতাটার কোন সন্ধান বা খোঁজ-খবর না পেয়ে ফিরে এলেন রেস্ট হাউসে। ফিরে এসেই দেখলেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে একজন লোক। করবেটকে দেখেই নমস্কার জানিয়ে বলল

লোকটি, গতকাল সন্ধ্যায় নাকি তার একটা গরু মারা পড়েছে বাঘের হাতে। আন্দাজ করলেন করবেট গতদিনে যে বাঘটাকে মারার প্রতীক্ষায় বসে ছিলেন তিনি, এটা তারই কাজ। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি যে ভাবেই হোক আজ বাঘটাকে মারবেনই। অত্যন্ত গরীব এই পাহাড়ী লোকদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন গরুগুলোকে মারার অপরাধে মরতেই হবে বাঘটাকে।

তাড়াতাড়ি দুপুরের খাওয়া সেরে লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন করবেট। পেছন পেছন মাচা বাঁধার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে চলল তাঁর আরও দু'জন লোক। বেলা তখন একটা।

গতকাল যেখানে বসে বাঘের অপেক্ষা করছিলেন করবেট সে-উপত্যকাটারই অন্যধারে গরুটা মেরেছিল বাঘ। সেটার কাছাকাছি এসে পাহাড়ের পাশের একটুকরো খোলা জমিতে দাঁড়িয়ে করবেটকে জায়গাটার অবস্থান বুঝিয়ে দিচ্ছিল গরুর মালিক। পাহাড়ের ওপর থেকে সিকি মাইল নিচে এক-খণ্ড সবুজ ঘাসভূমিতে গরুগুলো চরার সময় উপত্যকার দিক থেকে বেরিয়ে এসে গরুটাকে মারে বাঘ। বাকী গরু-গুলো আতঙ্কিত অবস্থায় ছুটতে ছুটতে পাহাড় পেরিয়ে অন্য পাশে তাদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছায়। এখান থেকে গ্রামে পৌঁছার সহজ উপায় হল উপত্যকা পার হয়ে যাওয়া। কিন্তু বাঘটাকে বিরক্ত করতে চান না বলে উপত্যকার মাথার ওপর দিয়ে ঘুরে যেখানে গরুটাকে মারা হয়েছে সেখানে নেমে

এলেন করবেট।

যে শৈলশিরার ওপর দিয়ে ছুটে পালিয়েছে, আর যে জায়গায় চরছিল গরুগুলো, এই দুই জায়গার মাঝে হালকা গাছের জঙ্গল। দো-আঁশ মাটিতে ছুটে পালানো পশুগুলোর খুরের দাগ স্পষ্ট হয়ে বসে গেছে, কাজেই ওগুলো অনুসরণ করে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হওয়ার জায়গাটায় পৌঁছতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হল না করবেটকে। জায়গাটার এখানে ওখানে চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে। ভারি গরুটাকে ছেঁচড়ে নিয়ে যাবার দাগও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মাটিতে। দাগ অনুসরণ করে চলতে শুরু করলেন করবেট, পেছন পেছন চলল গরুর মালিক সহ তিনজন লোক।

পাহাড় অতিক্রম করে দুশো গজ দূরের এক গভীর জঙ্গলাবৃত্ত গিরিখাদের কাছে এসে থামলেন তাঁরা। গিরিখাদের একটু দূর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটি ছোট্ট পাহাড়ী ঝর্ণা। এই ঝর্ণা আর গিরিখাদের মাঝখানের উঁচু জায়গাটুকু দিয়েই মড়িটাকে টেনে নিয়ে গেছে বাঘ। ফাঁকা মাঠে সকাল দশটায় মারা হয়েছিল গরুটাকে, আর তারপরই লোকচক্ষুর অন্তরালে কোন দুর্গম জায়গায় লুকিয়ে রাখার জন্যে মড়িটাকে টেনে নিয়ে গেছে সতর্ক বাঘ। টেনে নেবার দাগ ধরে ধরে আবার এগিয়ে চললেন করবেট।

চলতে চলতে দু'শো গজ নিচে নেমে এলেন করবেট আর তাঁর লোকজন। বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়ার ফলে পাহাড়ের পাশে এক জায়গায় একটা বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

এখান থেকেই শুরু হয়েছে আর একটা বিশাল গিরিখাদ। গর্তটার ওপরের দিকে পনের ফুট পর্যন্ত নেমে যাওয়া খাড়াইটার এখানে ওখানে জন্মে আছে বার ফুট লম্বা ওকের চারা আর মানদানী গাছ। এই কচি গাছের ঘের-এর মাঝখানের একটা গর্তে তার শিকার এনে ফেলেছে বাঘ। গরু-টাকে তখনও ছোঁয়নি বাঘ, বোধহয় সময়মত খাবে বলে রেখে দিয়েছে। ওটাকে দেখেই কেঁদে ফেলে বলল গরুর মালিক, 'লালীকে ছোট থেকে বড় করেছিলাম আমি, সাহেব। ও ছিল আমার মেয়ের মত।' লাল চামড়ার অপূর্ব সুন্দর মৃত গরুটার দিকে তাকিয়ে আর লোকটাকে কাঁদতে দেখে মায়া হল করবেটের। আর একবার প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি বাঘটাকে মারবেনই। কিন্তু তখনও জানতেন না তিনি, এটাই টেম্পল টাইগার বা মন্দিরের আশ্রিত সেই বাঘ।

আর দেরি না করে বসার জায়গা খুঁজতে শুরু করলেন করবেট। বিশাল কয়েকটা ওক গাছ আছে খাদের ওপারে, কিন্তু তার কোনটা থেকেই চোখে পড়বে না মড়িটা, আর ওইসব গাছে চড়াও অত্যন্ত কঠিন হবে। মড়িটা থেকে গজ তিরিশেক নিচে খাদের বাঁ দিকে একটা ছোট শক্ত হলি গাছ আছে। গুঁড়ি থেকে সমকোণে বেরিয়ে এসেছে তার ডালগুলো। সেই গাছটারই কোন ডালে বসা স্থির করলেন করবেট। মাটি থেকে ছ'ফুট উঁচুতে একটা বেশ মোটা ডাল আছে গাছটায়, সেখানে বসা যায়। আর তার একটু নিচে অপেক্ষাকৃত মোটা আর একটা ডালে বেশ আরাম

করে পা-ও রাখা যায়। মাটির এত কাছে করবেট বসতে যাচ্ছেন শুনে প্রবল আপত্তি করল তাঁর লোকেরা, কিন্তু কাছাকাছি সুবিধেমত আর কোন ভাল গাছ না থাকায় ওই হলি গাছটাতে বসাই স্থির হল শেষ পর্যন্ত। লোকজনদের চলে যাবার নির্দেশ দিলেন করবেট, এও বলে দিলেন, গত-দিন যে কুঁড়ের মালিকের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল বালা সিং সেখানেই যেন অপেক্ষা করে তারা। এই গিরিখাদটা থেকে কুঁড়েটার আড়াআড়ি দূরত্ব আধ মাইলের মত। কুঁড়ে থেকে এখানটা দেখতে পাবে না লোকেরা, কিন্তু হলি গাছে বসে কুঁড়েটাকে ঠিকই দেখতে পাবেন করবেট।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে হলি গাছে উঠে বসলেন করবেট। চলে গেল তাঁর লোকেরা। বিকেল তখন চারটে। পাহাড়টা পশ্চিমমুখো। বাঁয়ে হলি গাছের ডালপাতার ফাঁক দিয়ে গিরিখাদের পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত করবেটের দৃষ্টি-গোচর হচ্ছে। তাঁর সামনে প্রায় দশ ফুট গভীর ও কুড়ি ফুট চওড়া গিরিখাদ। গিরিখাদের ওপারের পাহাড়টায় শুধু পাথর আর পাথর, একটা গাছের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। দক্ষিণে বিনাবাধায় শৈলশিরাটা পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যায়, কিন্তু মড়িটাকে চোখে পড়ে না, ঘন কচি গাছের অরণ্যে ঢাকা পড়ে আছে ওটা। পেছনে রিংগল গাছের ঘন বন। বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়ে সৃষ্টি হওয়া গর্তে মড়িটাকে রেখে খাদ ধরে নেমে গেছে বাঘ এবং যতদূর সম্ভব এ পথেই ফিরবে সে। এ কারণেই খাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন করবেট।

প্রয়োজনের সময় কাজে লাগাবার জন্যে রাইফেলটা সম্পূর্ণ তৈরি করে রেখেছেন তিনি। দু'নলা রাইফেলটার দু'টো চেম্বারেই তাজা গুলি ভরে রেখেছেন। অর্থাৎ আজ এলে বাঘকে আর কিছুতেই ছেড়ে দেবার ইচ্ছে নেই তাঁর।

প্রচুর শম্বর, কাকর আর হনুমান আছে এখানকার জঙ্গলে, আর আছে পাহাড়ী নীল হাঁড়ি চাঁছা, ছাতারে, দামা ও নীলকণ্ঠ। বাঘ বা চিতাবাঘ দেখলে হুঁশিয়ারি জানায় ওরা, কাজেই চিন্তা নেই করবেটের। বাঘ এলে ওরাই জানান দেবে। কিন্তু কোন রহস্যময় কারণে জানান দিল না ওরা সেদিন। অকস্মাৎই টের পেলেন করবেট, মড়ির কাছে পৌঁছে গেছে বাঘ। খাদ ধরে নিচে নেমেছিল বাঘটা, বোধহয় পানি খাবার জন্যেই, কিন্তু ফেরত আসেনি ও পথে। বরং রিংগলের ঝোপ ঘুরে ওপাশ দিয়ে গিয়ে পৌঁছেচে মড়ির কাছে। বাঘটার এ ধরনের অদ্ভুত কার্য-কলাপে অবাক হলেন করবেট।

মাংস ছেঁড়ার আর হাড় চিবোনোর শব্দ শুনতে লাগলেন করবেট। মিনিট পনের পর পাহাড়ের গা ধরে বাঁ দিক থেকে ডানে আসতে দেখলেন তিনি ভালুকটাকে। বেশ বড় জাতের হিমালয়ের কাল ভালুক, যেন কোন তাড়া নেই এমনিভাবে ধীরে সুস্থে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে ওটা। হঠাৎ কিছু টের পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ভালুকটা। এক সেকেণ্ড ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে করে উবু হয়ে শুয়ে পড়ল মাটির ওপর। মিনিট দুই একভাবে পড়ে থেকে মাথা তুলে

বাতাসে গন্ধ শুঁকল, তারপর শুয়ে পড়ল আবার। নিচ থেকে বয়ে আসা পাহাড়ী হাওয়ায় রক্তের গন্ধ পেয়েছে ভালুকটা, সেই সাথে বাঘের গায়ের গন্ধও। মড়িটার সামান্য ডানে বসে আছেন করবেট, তাই তাঁর গায়ের গন্ধ পৌঁছায়নি গিয়ে ভালুকের নাকে। আরও মিনিটখানেক পড়ে থেকে উঠে পড়ল ভালুকটা, তারপর অতি ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল বাঘটার দিকে।

গুঁড়ি মেরে পাহাড় থেকে নেমে আসছে কোন ভালুক, ব্যাপারটা সত্যিই বিস্ময়কর। ওভাবেই প্রায় দু'শ গজ পেরোতে হবে তাকে। বাঘ বা চিতার মত নিঃশব্দে এগোবার মত করে তৈরি নয় ভালুকের শরীর। কিন্তু আশ্চর্য! সাপের মত স্বচ্ছন্দে আর ছায়ার মত নিঃশব্দে জায়গাটুকু পেরিয়ে গেল ওই ভালুকটা। এগোতে এগোতে ক্রমেই আরো সাবধান হয়ে উঠছে জানোয়ারটা। পনের ফুট খাড়াইটার ওপরের ধার থেকে কয়েক ফুট দূরে থাকতেই পেটের ওপর ভর দিয়ে হেঁচড়ে এগুতে শুরু করল সে। গর্তের ধারে পৌঁছে উঁকি মেরে গর্তের ভেতরে ভোজন রত বাঘটাকে একবার দেখে নিল ভালুকটা, তারপর যেমন নিঃশব্দে এগিয়েছিল তেমনি ভাবে পিছিয়ে গেল ফুটখানেক। প্রচণ্ড উত্তেজনায় ওদিকে তখন কাঁপছে করবেটের সারা শরীর, শুকিয়ে গেছে ঠোঁট-জিভ-গলা।

নিজের শিকারী জীবনে দু'দুবার বাঘের মড়ি নিয়ে পালিয়ে যেতে দেখেছেন করবেট হিমালয়ের কাল ভালুককে।

কোনবারই তখন মড়ির কাছে ছিল না বাঘ। আরও দু'বার চিতাকে তাড়িয়ে দিয়ে তার মড়ি কেড়ে খেতে দেখেছেন তিনি ভালুককে। কিন্তু এবারে চিতা নয়, মড়ি আগলে বসে আছে বিশালদেহী এক পুরুষ বাঘ, চিতার মত লেজ গুটিয়ে পালাবার বান্দা অন্তত সে নয়। ভারতের জঙ্গলের সম্রাটকে তাড়িয়ে দিয়ে তার মড়ি কেড়ে নেবার মত সাহস নিশ্চয়ই হবে না ভালুকটার, মনে মনে ভাবলেন করবেট। কিন্তু ভুল অনুমান করলেন তিনি।

বাঘটা তখন হাড় চিবোতে ব্যস্ত। এই সুযোগে নিজেকে গর্তের একেবারে কিনারে টেনে আনল ভালুকটা। তারপর সামনের পা দুটো জড়ো করে বিকট চিৎকার করে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল গর্তের ভেতর। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল প্রলয় কাণ্ড। বাঘ আর ভালুকের মিলিত হুংকারে কেঁপে উঠল আশপাশের পাহাড়-জঙ্গল-উপত্যকা।

এখান থেকে জানোয়ার দুটোর লড়াইটা দেখতে পাচ্ছেন না করবেট, কিন্তু ওদের হাঁক ডাক থেকে আন্দাজ করতে পারছেন সব কিছুই। মিনিট তিনেক একভাবে লড়াই করার পর রণে ভঙ্গ দিল বাঘটা। একলাফে গর্ত থেকে উঠে এসে করবেটের সামনের খোলা জায়গাটায় দাঁড়াল সে। এক সেকেণ্ড পরই বিকট চিৎকার করতে করতে গর্ত থেকে বেরিয়ে বাঘটার দিকে ছুটে এল ভালুকটা। বাঘটাকে লক্ষ্য করে রাইফেল তুললেন করবেট। ট্রিগারে চাপ দিচ্ছেন ঠিক এই সময় বাঁ দিকে ঘুরে একলাফে কুড়ি ফুট লম্বা

খাদটা পার হয়ে একেবারে হলি গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল বাঘ। রাইফেলের ট্রিগার টেপা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে ততক্ষণে। বাঘটা শূন্যে থাকতেই কোনমতে রাইফেলের নলের মুখটা ঘোরাতে পেরেছিলেন করবেট। কিন্তু গুলিটা বাঘের গায়ে লাগল কি লাগল না বলতে পারবেন না তিনি।

রাইফেলের শব্দকে ছাপিয়ে বিকট গর্জন করে উঠল বাঘটা। করবেটকে দ্বিতীয়বার গুলি করার সুযোগ না দিয়ে একলাফে ঢুকল গিয়ে পেছনের রিংগল ঝোপে। ঝোপ ঝাড় ভেঙে তার কয়েক গজ পর্যন্ত সামনে ছুটে যাবার শব্দ হল, তারপরই নীরবতা। বোধহয় গুলিটা ঠিকই খেয়েছে বাঘ এবং কিছুদূর এগিয়ে ধুপ করে পড়ে মারা গেছে সে।

এমনিতেই ·৫০০ বোরের রাইফেলের আওয়াজ খুব জোরে হয়, আর এখানে, এই খাদের দেয়ালে বাধা পেয়ে তার আওয়াজটা শোনাল কামান গর্জনের মত। কিন্তু সেই শব্দে ভয় পেয়ে ছুটে পালানো দূরে থাক, আরও ক্ষেপে গেল উন্মত্ত ভালুকটা। বাঘের পেছনে পেছনে ছুটে এসে ওটার মত লাফিয়ে পার না হয়ে খাদের পাড় বেয়ে নেমে সোজা ছুটে এল সে করবেটের দিকে। বিশাল পুরুষ বাঘকে ভোজনরত অবস্থায় তার মড়ি থেকে হটিয়ে দেবার সাহস রাখে যে জানোয়ার তাকে মারার কোন ইচ্ছেই ছিল না করবেটের, কিন্তু ভালুকটাকে তাঁর কাছে আসতে দেওয়াটাও পাগলামীরই নামান্তর। সুতরাং রাইফেল তুলে তৈরি হয়ে বসলেন তিনি। ভালুকটা তাঁর কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট

দূরে থাকতেই ট্রিগার টিপলেন তিনি। ছুটন্ত অবস্থায় কপালে গুলি খেয়ে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভালুকটা, তারপর আস্তে আস্তে পিছলে নেমে যেতে থাকল খাদের নিচে।

বাঘের গর্জন, ভালুকের চিৎকার আর ভারি রাইফেলের কান ফাটানো আওয়াজ থেমে যাবার পর অস্বাভাবিক নীরব মনে হল খাদ আর তার আশপাশের বনভূমিকে। সমস্ত উত্তেজনা প্রশমিত হবার পর সিগারেট খাবার কথা মনে পড়ল করবেটের। দু'হাঁটুর ওপর আড়াআড়ি ভাবে রাই-ফেলটা রেখে পকেটে হাত ঢোকালেন তিনি। ঠিক সেই মুহূর্তে ডান দিকে নড়াচড়ার শব্দ টের পেলেন করবেট। মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন, মিনিট দুয়েক আগে যেখান থেকে লাফিয়ে খাদ পার হয়ে এসেছিল বাঘটা, সেখান দিয়েই ধীরেসুস্থে হেঁটে চলে যাচ্ছে সে। চলতে চলতেই তাকাচ্ছে খাদের নিচে পড়ে থাকা মৃত শত্রুর দিকে।

ব্যাপার দেখে দু'এক সেকেণ্ড বিমূঢ়ের মত বসে থাকলেন করবেট, তারপর থাবা মেরে দু'হাঁটুর ওপর থেকে তুলে নিলেন রাইফেলটা। এমনিতেই আণ্ডার লিভার মডেলের রাইফেলটায় গুলি ভরা শক্ত, তার ওপর গুলিগুলো প্যান্টের পকেটে থাকায় গাছের ওপর বসা অবস্থায় সেখান থেকে গুলি বের করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াল করবেটের পক্ষে। তিনি প্যান্টের পকেট থেকে গুলি বের করার আগেই পাহাড়টার কাছে পৌঁছে গেল বাঘ, তারপর খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে

পৌঁছল গিয়ে চল্লিশ গজ দূরের এমন এক জায়গায় এবং এঙ্গেলে যাকে কেউ কেউ বলে থাকে রাইফেল শুটিং-এর 'ইলেভন-ও-ক্লক' (ঘড়ির কাঁটা এগারটার ঘর নির্দেশ করলে যেমন ঈষৎ বাঁয়ে হেলে থাকে, তেমনই এঙ্গেল)। একটা বড় পাথরের ওপর দিয়ে চলছিল তখন বাঘটা। কোন মতে পকেট থেকে একটা গুলি বের করে রাইফেলে ভরে গুলি ছুঁড়লেন করবেট। সঙ্গে সঙ্গে পিছু হটে এসে এক-পাশে কাত হয়ে বেকায়দা ভাবে পড়ে গেল বাঘটা, পরক্ষণেই হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শৈলশিখরের পাশ দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে লেজ তুলে ছুটে পালাল। পরে অনুসন্ধান করে দেখেছিলেন করবেট, নিকেলের আধারে ভরা নরম-মাথা আর ইস্পাতের গোড়াওয়ালা বুলেটটি সরাসরি গায়ে না লেগে বাঘের কয়েক ইঞ্চি সামনের পাথরে লেগে ছিটকে এসে তার মুখে বাড়ি খেয়েছিল মাত্র, আর তাতেই ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি বাঘের।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ ধূমপান করার পর ভালুকটাকে দেখতে গাছ থেকে নেমে এলেন করবেট। সাধারণের চাইতে আকারে অনেক বড় ভালুকটা। শরীরের ক্ষতগুলো দেখলেই আন্দাজ করা যায় কতটা ভয়ংকর লড়াই হয়েছিল তার বাঘের সাথে। গলার কাছের গভীর ক্ষত থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্তে ভিজে গিয়ে গায়ের সাথে লেপটে আছে তার মোটা লোমের আবরণ। বাঘের থাবার তীক্ষ্ণধার নখের

আঘাতে চিরে গিয়ে মাথার খুলির হাড় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ভালুকটার। চিরে ফালা ফালা হয়ে গেছে নাকটা, আর এ জন্যেই বোধহয় শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়েছিল জানোয়ারটা। নাকে থাপ্পড় দেওয়া! বাঘের কাছে এতবড় অপমান হওয়ার পর করবেটের ভারি রাইফেলের আওয়াজকে গ্রাহ্য না করাই বরং ভালুকটার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

সাঁঝ হয়ে আসছে। ভালুকটার ছাল ছাড়িয়ে নেবার জন্যে লোকজনদের ডেকে পাঠাবার মত যথেষ্ট সময় না থাকায় কুঁড়ে থেকে তাদের ডেকে নিয়ে রাত হবার আগেই রেস্ট হাউসে ফিরলেন করবেট, কারণ এ অঞ্চলেই কোথাও আছে মানুষখেকো চিতাটা।

রেস্ট হাউসে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় বসে সবাইকে বাঘ ভালুকের লড়াইয়ের গল্পটা বললেন করবেট। সব শুনে লোকেরা জানাল ভালুকটার চিৎকারকে আসলে করবেটের আর্তনাদ বলেই ভেবেছিল তারা। ভালুকটার প্রথম চিৎকারকে তারা ভেবেছিল গাছ থেকে করবেটকে টেনে নামাবার সময় চেঁচিয়ে উঠেছেন তিনি। তারপর একটানা অনেকক্ষণ বাঘ আর ভালুকের চিৎকারকে ভেবেছে করবেট আর বাঘের লড়াইয়ের সময়কার চিৎকার (যদিও তা ভাবাটা একেবারেই অন্যায় হয়েছে তাদের। কারণ কোন মানুষ এতক্ষণ ধরে বাঘের সাথে হাতাহাতি লড়াই করতে পারে না। কিন্তু করবেটকে আসলে অতিমানব বলে ভাবত কুমায়ুনের ওই সব পাহাড়ী অঞ্চলের লোকেরা। তারা মনে করত খালি

হাতেই বাঘকে পরাস্ত করার ক্ষমতা রাখেন করবেট)। শেষে শুধু ভালুকটার একাকী চিৎকার শুনে তারা ভেবেছিল ওই বিশেষ বাঘটার (যেহেতু মন্দিরের দেবীর আশ্রিত) হাতে পরাস্ত হয়েছেন করবেট, এবং তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাঘ, তাই তিনি ছাড়া পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে চেঁচাচ্ছেন। এর কয়েক মুহূর্ত পরই রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় লোকেরা। তারা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিল না, কি করে একজন লোক বাঘের মুখে থেকেও রাইফেল চালাতে পারে। শুনে মৃদু হাসলেন করবেট। ভালুকের চিৎকারকে অবশ্য করবেটের চিৎকার ভেবে খুব একটা ভুল করেনি ওরা। কারণ দূর থেকে ভালুকের চিৎকারকে মানুষের চিৎকার বলেই ভুল হয় অনেক সময়।

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে আগের দিনে মারা ভালুকটার ছাল ছাড়াতে চললেন করবেট। তার পেছনে পেছনে চলল আশপাশের কয়েকটা গাঁয়ের বহুলোকের এক মিছিল। ভোর হতে হতেই খবর পেয়ে গেছে ওরা; বিশাল একটা ভালুক মারা পড়েছে করবেটের হাতে। জানোয়ারটাকে দেখতে নয়, ভালুকের চর্বি নাকি বাতের মহৌষধ, তাই এই চর্বি জোগাড়ের জন্যেই রেস্ট হাউসের সামনে এসে জমায়েত হয়েছিল তারা। তারপর করবেটের মুখ থেকে যখন শুনল চর্বির কিছুমাত্র দরকার নেই তাঁর, শুধু ছালটা হলেই চলবে, তখন খুশিতে লাফাতে শুরু করল তারা। ওই ভালুকের চর্বির জন্যেই করবেটের পিছু পিছু চলেছে জনতার মিছিল।

চামড়াটা ছাড়ানো হয়ে যাবার পর দেখতে দেখতে ভালুকটার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো ভাগ করে নিল লোকেরা। বালা সিংকে ছালটা দান করে দিলেন করবেট। এতবড় উপহার পেয়ে গর্বে মাটিতে আর পা পড়ে না বালা সিং-এর। সবার ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছে সে।

কাজ শেষ করে রেস্ট হাউসে ফিরে চললেন করবেট। ভালুকের চামড়াটা কায়দা করে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে তাঁর পিছু পিছু চলল বালা সিং।

কিছুদূর এসে কি মনে করে একবার পেছন ফিরে চাইলেন করবেট। সেই সময়ই চোখে পড়ল তাঁর গরুর মড়িটা আর ভালুকের অপ্রয়োজনীয় দেহাবশেষ যে খাদটায় পড়ে আছে তার ওপরের আকাশে পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে কয়েকটা শকুন। অর্থাৎ খাবারগুলো দেখে ফেলেছে শকুনেরা। সন্ধ্যার মধ্যেই মরা গরু আর ভালুকের হাড়গুলো ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না কুৎসিত পাখীগুলো।

*

রেস্ট হাউসে ফেরার পথেই একজন উত্তেজিত বনরক্ষকের সাথে দেখা হয়ে গেল করবেটের। হন্তদন্ত হয়ে তাঁর কাছেই ছুটে আসছিল বনরক্ষক। গতদিন টহল দিতে দিতে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল সে, তাই ভালুক মারার সংবাদ শুনতে পায়নি। সকালে বেনের দোকানে খবরটা শুনেই ছুটে আসছে সে। খানিকটা চর্বির তার ভীষণ দরকার। তার বাবা কিছুদিন যাবৎ বাতে শয্যাশায়ী।

কথায় কথায় বনরক্ষক জানাল এখানে আসার সময় একপাল ছুটন্ত গরুর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে যায় তার। গরুর পালের পেছন পেছন ছুটছিল একটা রাখাল বালক। ছোটার কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারে বনরক্ষক রাখালের একটা গরুকে নাকি বাঘে মেরেছে। যেখানে গরু মেরেছে বাঘ, সে জায়গাটা সম্পর্কে বনরক্ষকের মোটামুটি একটা ধারণা আছে।

সুতরাং বালা সিং আর সঙ্গের অন্য লোকেরা রেস্ট হাউসে চলে গেল। বনরক্ষকের সাথে করবেট চললেন গরুর মড়িটার খোঁজে। দু'মাইলের কিছু বেশি চড়াই উৎরাই পেরিয়ে একটা ছোট্ট উপত্যকায় এসে পৌঁছুলেন করবেট। বনরক্ষকটির ধারণা এখানেই কোথাও মারা পড়েছে গরুটা।

দিন কয়েক আগে আলমোড়ার গুর্খা ডিপোতে কিছু অকেজো মালপত্র বিক্রি হয়, সেখান থেকে একজোড়া পুরোনো আর্মি বুট কিনেছিল করবেটের পথপ্রদর্শক বনরক্ষীটি। তার পায়ের চেয়ে বুটজোড়া অনেক বড়। তাই পায়ে দিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে কোনমতে করবেটের সাথে দ্রুত চলার তাল রাখছিল লোকটি, তার চলার ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছিল উঁচু নিচু পাহাড়ী পথে চলতে দারুণ অসুবিধে হচ্ছে তার। অবস্থা দেখে জোর করে লোকটার পা থেকে তার বুট খুলিয়ে নিলেন করবেট। দেখা গেল বড় বড় ফোস্কা পড়ে গেছে বনরক্ষকের পায়ে। ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন করবেট, 'এত বড় জুতো কিনেছ কেন তুমি?'

চিরজীবন খালি পায়েই কেটেছে বনরক্ষকের। নাম মাত্র দামে বুট কিনে পায়ে দেবার লোভ তাই সংবরণ করতে পারেনি সে। করবেটের প্রশ্নের উত্তরে বলল বনরক্ষক, 'ভেবেছিলাম পায়ে দিতে দিতে কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাবে জুতোজোড়া।' লোকটার কথায় হাসি চেপে রাখা সম্ভব হল না করবেটের পক্ষে।

পনের বিঘার মত জায়গা জুড়ে এই নৌকাকৃতির ছোট্ট উপত্যকাটি, মাঝে মাঝে বিরাট সব ওক গাছ, সব মিলিয়ে একটা চমৎকার পার্কের মত। যেদিক দিয়ে করবেট নেমে এসেছেন, ঢালু হয়ে নেমে গেছে সেদিকটা এবং তাতে কোন ঝোপঝাড় নেই। উল্টো দিকটা খাড়া উঠে গেছে ওপরের দিকে, কিছু কিছু ঝোপঝাড় আছে ওদিকটায়। উপত্যকার মুখে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট ধরে সমস্ত জায়গাটায় তীক্ষ্ণ চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার করবেট, সন্দেহজনক কিছু না দেখে ঘাসে ঢাকা ঢালু পথ বেয়ে নামতে থাকলেন। পেছন পেছন হাতে বুট ঝুলিয়ে খালি পায়ে নামতে থাকল বনরক্ষক।

উপত্যকার তলদেশের সমতল ভূমিতে নেমে দেখলেন করবেট, আশপাশের অনেকখানি জায়গা থেকে শুকনো পাতা আর ডালপালা আঁচড়ে আঁচড়ে এনে একটা বড় ঢিবি মত তৈরি করা হয়েছে একজায়গায়। যদিও মরা গরুটার শরীরের কোন অংশই নজরে পড়ছে না করবেটের, তবুও জানেন তিনি ওই শুকনো ডালপাতার তলায়ই আছে ওটা।

বাঘেদের এভাবে মড়ি লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটা জানা আছে অভিজ্ঞ শিকারীদের। বাঘ যখন এভাবে তার মড়ি লুকিয়ে রাখে তখন ধরে নেওয়া হয় মড়ির আশপাশে কোথাও নেই সে। কিন্তু সব সময়ই এমন ধারণা করা নিরাপদ নয়। এ কারণেই উপত্যকায় নেমে এসে আশপাশটায় ভাল মত চোখ বুলিয়ে নেবার জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন করবেট।

ডালপাতার ঢিবির অদূরেই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ করে উঠে গেছে পাহাড়টা। চল্লিশ গজ ওপরে পাহাড়ের গা ছোট ছোট ঝোপঝাড়ে ঠাসা। ওইরকম একটা ঝোপের দিকে চোখ পড়তেই বাঘটাকে দেখতে পেলেন করবেট। করবেটের দিকে পিঠ দিয়ে একটু চ্যাটালো জায়গায় শুয়ে আছে বাঘটা। এখান থেকে তার মাথার খানিকটা এবং ঘাড় থেকে পেছনের পা পর্যন্ত প্রায় তিন ইঞ্চি চওড়া লম্বালম্বি কাল ডোরা দেখতে পাচ্ছেন করবেট। এ অবস্থায় বাঘের মাথায় গুলি করার কোন প্রশ্নই ওঠে না, শরীরের অন্যান্য জায়গায়ও গুলি করে তেমন কোন লাভ নেই। বড়-জোর সামান্য আহত করা যাবে বাঘটাকে।

তাড়া নেই করবেটের। পুরো বিকেলটা আছে তাঁর হাতে। সন্ধ্যার আগে একবার না একবার উঠে দাঁড়াবেই বাঘটা, তখন ধীরেসুস্থে গুলি করা যাবে ভেবে অপেক্ষা করতে থাকলেন করবেট।

একটু পরই বাঁ দিকে নড়াচড়া টের পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন করবেট। দেখলেন, নিঃশব্দে পাহাড় বেয়ে মড়িটার

দিকে নেমে আসছে একটা ভালুক, পেছনে ছোট ছোট দুটো বাচ্চা। মরা গরুটার গন্ধ পেয়েছে নিশ্চয়ই ভালুকটা, তাই অনুসন্ধান করতে আসছে। তা নাহলে এই ভর দুপুরে রোদ মাথায় করে খোলা জায়গায় চলাফেরা করতো না ভালুকটা, অকারণে কখনও করে না তা ভালুকরা।

ভালুকটাকে দেখে আপসোস হতে লাগল করবেটের। না, বাঘটা হাত ছাড়া হয়ে যাবার ভয়ে নয়, চমৎকার একটা দৃশ্য দেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে। এখন যে জায়গাটায় বসে আছেন তিনি, সেখানে না থেকে যদি উপত্যকার মুখটায় দাঁড়িয়ে থাকতেন, তাহলে দেখতে পেতেন তিনি দৃশ্যটা। তীক্ষ্ণ ঘ্রাণ শক্তির বলে অনায়াসেই মড়িটা খুঁজে বের করে ফেলত ভালুকটা। অত কাছে থেকে বাঘের নজরও এড়াতে পারত না সে কিছুতেই। ফলে বাঘ আর ভালুকের লড়াইটা হত দেখার মত।

এতক্ষণ ভালুকগুলোকে দেখতে পায়নি বনরক্ষক। ও-গুলো আরও কাছে এসে যেতেই দেখতে পেয়ে 'ভালু, ভালু' বলে চেঁচিয়ে উঠল সে। তার চেঁচামেচিতে একলাফে উঠে দাঁড়াল বাঘটা। এদিক ওদিক একবার চেয়েই দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। প্রায় কুড়ি গজ খোলা জায়গার ওপর দিয়ে যেতে হবে তাকে। তাই তাড়াহুড়ো না করে ওটার দিকে নিশানা করলেন করবেট। ট্রিগারে চাপ দিচ্ছেন এমন সময় করবেটের হাত জড়িয়ে ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি মারল বনরক্ষক। বাঘটাকে দেখতে পায়নি সে, তাই ভুল দিকে নিশানা

করছেন ভেবেই করবেটের লক্ষ্য ভালুকগুলোর দিকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিল আসলে সে। কিন্তু ওদিকে ট্রিগারে চাপ দিয়ে ফেলেছেন করবেট। কাজেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গুলিটা গিয়ে বাঘটার কয়েক গজ দূরের একটা গাছে লাগল। রাইফেলের আওয়াজ শুনে একছুটে পাহাড়ের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল বাঘটা।

বনরক্ষকের ওপর রাগ করে লাভ নেই, কারণ বাঘটাকে দেখতে পায়নি সে। তাছাড়া তার ধারণা ভয়ঙ্কর ভালুক-গুলোকে দেখিয়ে দিয়ে করবেটের প্রাণ রক্ষা করেছে সে এ-যাত্রা। রাইফেলের আওয়াজ শুনে পালাচ্ছিল ভালুকগুলোও। 'মারো, মারো' বলে প্রচণ্ড উৎসাহ দিতে শুরু করল করবেটকে বনরক্ষক। কিন্তু ভালুকগুলোকে মারলেন না করবেট।

ভালুক না মারায় অত্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল বনরক্ষক। কারণ তার আশা ছিল একটা ভালুক অন্তত মারতে পারলে কিছুটা চর্বি সংগ্রহ করতে পারবে সে। অতএব তাকে কিছুটা উৎসাহিত করার জন্যে 'ঘুরাল' মারার প্রস্তাব করলেন করবেট। শুনে কিছুটা নয়, পুরোপুরিই উৎসাহিত হয়ে উঠল বনরক্ষক। কোথায় কোথায় 'ঘুরাল' পাওয়া যায় তার এক বিরাট ফিরিস্তি দিতে শুরু করল সে করবেটকে।

ঘুরাল মারার পর তা বয়ে নেবার জন্যে লোক দরকার, তাই রেস্ট হাউসের দিকে চললেন করবেট। রেস্ট হাউসে পৌঁছে এক কাপ চা খেয়ে বনরক্ষক ছাড়াও সঙ্গে আরও দু'জন লোক নিয়ে রওনা হলেন আবার। রেস্ট হাউসের

বারান্দা থেকে খাড়া নেমে যাওয়া পাহাড় বেয়ে কয়েকশো গজ নামতেই পাহাড়ের মুখোমুখি ফুটখানেক চওড়া ঘুরাল চলাচলের পথের ওপর এসে পড়লেন তাঁরা। সবার আগে আগে চলছেন করবেট। এভাবে প্রায় আধ মাইলটাক দক্ষিণে চলার পর একটা শৈলশিরায় উঠে এলেন করবেট আর তাঁর লোকেরা। এই শৈলশিরার নিচের উপত্যকার ঘাস-ভূমিতে চরে বেড়ায় ঘুরাল। শৈলশিরায় উঠে নিচে তাকালেন করবেট। একটা গভীর গিরিখাদ চোখে পড়ল তাঁর। খাদের অন্যপাশে একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে একটা ঘুরাল। ছাগল জাতীয় অন্যান্য প্রাণী, যেমন থর, আইবেক্স, মারকর প্রভৃতি সবার ক্ষেত্রেই এই দূরে তাকিয়ে থাকার স্বভাব বর্তমান। গলায় সাদা চক্কর দেখেই বোঝা গেল পাথরের ওপর দাঁড়ানো ওই ঘুরালটা পুরুষ ঘুরাল। এখান থেকে দুশো গজ হবে ওটার দূরত্ব।

নতুন রাইফেলটি নিয়ে ঘুরাল মারতে বেরিয়েছিলেন করবেট। উদ্দেশ্য ওটার কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করা। আর দেরি না করে উবু হয়ে শুয়ে পড়ে ভাল মত নিশানা করে ট্রিগার টিপলেন করবেট। গুলি খেয়ে পাথরটার ওপরই পড়ে গেল ঘুরালটা। ভাগ্য বলতে হবে যে বেশি নড়াচড়া করেনি ঘুরালটা, তাহলে পড়তো গিয়ে পাশের কয়েকশো ফুট গভীর খাদে। সেখানে পড়লে আর তাকে তুলে আনা সম্ভব হতো না।

ঘুরালটা পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে খাদের অন্য দিকের

পাহাড়ের ফাটলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আর একটা মাদী ঘুরাল, সাথে একটা বাচ্চা। পাহাড়ের ওপরে বসে থাকা করবেট ও তাঁর সঙ্গের লোকজনের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলে গেল ঘুরালটা।

মৃত ঘুরালের চামড়াটা ও খানিকটা মাংস বনরক্ষককে দিয়ে দিলেন করবেট। এতে সে ভালুকের চর্বি না পাওয়ার দুঃখ ভুলে গেল। সোৎসাহে বলল বনরক্ষক, চামড়াটা দিয়ে তার বাবার জন্যে একটা আসন বানিয়ে দেবে সে। কারণ বার্ধক্য আর বাতের জন্যে সারাদিন রোদে পড়ে থাকতে হয় তার বাবাকে।

*

পরদিন ভোরে উঠে আগের দিনে ফেলে যাওয়া বাঘের মড়িটাকে দেখতে আবার সেই উপত্যকায় গিয়ে হাজির হলেন করবেট। বাঘ আর ফিরে আসেনি মড়ির কাছে, তবে ভালুকরা এসেছিল। হাড় ছাড়া কিছুই আর পড়ে নেই তখন মরা গরুটার। ওই হাড়গুলোকেই ঠোকরাচ্ছে একটা রাজা শকুন। দুপুর পর্যন্ত এদিক ওদিক মানুষখেকো চিতাটার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়ে রেস্ট হাউসে ফিরে এলেন তিনি। এসেই শুনলেন খবরটা, আর একটা গরু মারা পড়েছে বাঘের হাতে।

খবরটা দিল এক যুবক। আলমোড়া আদালতে মামলার হাজিরা দিতে যাবার সময়ই গরুটাকে বাঘে মারতে দেখেছে সে। মোটামুটি বুদ্ধিমান সে। বারান্দার মেঝেতে কাঠ-

কয়লা দিয়ে এঁকে করবেটকে বুঝিয়ে দিল সে, কোথায় মারা পড়েছে গরুটা।

দুপুরের খাওয়া সেরেই মড়িটা খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন করবেট। আগের দিন যেখানে বাঘটাকে গুলি করেছিলেন তার মাইল পাঁচেকের মধ্যেই ঘটেছে ঘটনাটা। জায়গাটায় পৌঁছে দেখা গেল মুল উপত্যকা বরাবর নদীর পার ধরেই এসেছিল বাঘ। ওখানেই চরছিল গরুগুলো। নরম মাটিতে তার পায়ের চিহ্ন দেখে বোঝা গেল গরুটাকে মারতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে বাঘকে। আশপাশের মাটিতে রক্ত পড়ে নেই খুব একটা। তার মানে গরুটাকে মারার পর পরই ওটাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেছে বাঘ। ছ'সাতশ পাউণ্ড ওজনের একটা প্রাণীকে মারার পর বিন্দুমাত্র না জিরিয়ে ওই লাশের বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে পারে যে জানোয়ার তার শক্তি সহজেই অনুমেয়। পায়ের ছাপ দেখে বোঝা গেল লাশসহ নদী পার হয়ে পাহাড়ের নিচে গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গেছে বাঘ।

নদী পেরিয়ে বাঘের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে চললেন করবেট। একটু এগোনোর পরই গরুটাকে মাটিতে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার দাগ চোখে পড়ল তাঁর। সে-দাগ ধরে গভীর বনের মধ্যে দিয়ে খাড়াই পাহাড় বেয়ে উঠে গেলেন তিনি। পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে প্রায় দু'শ গজ নিচের দুটো ওক গাছের চারার মাঝে আটকে যাওয়া গরুর পেছনের পা'টা চোখে পড়ল তাঁর। আরো এগিয়ে

বুঝতে পারলেন, শুধু ওই একটা পা-ই আটকে আছে ওখানে। পা'টা আটকে যাওয়ার পর তা ছাড়াতে না পেরে প্রচণ্ড ঝটকায় লাশের দেহ থেকে পা'টা ছিঁড়ে রেখে বাকী অংশটা নিয়ে পাহাড়ের ওপর দিকে চলে গেছে বাঘ। বাঘটা যেখানে তার মড়ি নিয়ে উঠে এসেছে পাহাড়ের সে-জায়গাটা একটু চ্যাপ্টা মত। দু'থেকে তিন ফুট জুড়ে কতগুলো ওকের চারা বেড়ে উঠেছে জায়গাটায়। গাছ-গুলোর গোড়ায় কোন ঝোপঝাড় নেই। এখানেই মড়িটাকে ফেলে রেখে গেছে বাঘ।

যদিও মাত্র একটা রাইফেল আর কয়েকটা কার্তুজ বয়ে এনেছেন করবেট, তবু ধীরে ধীরে একটানা পাহাড়ী পথ বেয়ে ওঠায় সাংঘাতিক পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। ঘামে ভিজে গায়ের সাথে লেপ্টে গেছে শার্টটা, শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে কণ্ঠনালী। তাঁর অবস্থা দেখে কল্পনা করতে কষ্ট হয় না এতবড় একটা ভারি বোঝা বয়ে এনে কি পরিমাণ তৃষ্ণার্ত হয়েছিল বাঘটা। করবেট নিশ্চিত, পানি খেতেই গেছে বাঘটা। তাঁর নিজেরও পানি খাওয়া দরকার। হয়তো পানি খেতে গিয়েই বাঘের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। যে পাহাড়ী নালার ওপর ভালুক মেরেছিলেন তিনি, এখান থেকে ডান দিকে আধ মাইল গেলেই সেটা পাওয়া যাবে। বাঁ দিকে তারচেয়ে কাছে আরেকটা নালা আছে। সেখানে যাওয়াই স্থির করলেন করবেট। কারণ স্বাভাবিক কারণেই কাছের নালাটায় যেতে চাইবে বাঘটা।

নালাটায় পৌঁছে পানি খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে নালা ধরেই আধ মাইলের মত নেমে গেলেন করবেট। নালাটা এখানে সরু হয়ে দু'ধারের খাড়াই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। এখান পর্যন্ত এসে একটা প্রকাণ্ড পাথরের পাশ ঘুরে এসেই থমকে দাঁড়ালেন করবেট। এখান থেকে মাত্র গজ বিশেক দূরে একটা ছোট্ট জলা। জলাটার ডান দিকে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত একটা সরু বালির চড়ায় জলার দিকে পিঠ করে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে বাঘটা। এখান থেকে শুধু তার লেজসহ পেছনের কিছুটা অংশ চোখে পড়ছে করবেটের। বাঘ আর তার মাঝের মাটিতে কিছু শুকনো ডালপাতা পড়ে আছে। মোষকে খাওয়াবার জন্যেই হয়তো গাছ থেকে পাড়া হয়েছিল ওগুলো। ওগুলো পেরিয়ে বাঘের কাছে এগোতে গেলেই শব্দ হবে। পাথরটার ওপর দিয়েও শব্দ না করে যাওয়া যাবে না। একমাত্র পথ, চুপ-চাপ এখানে বসে অপেক্ষা করা।

প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর পেট ভরে পানি খেয়ে বাঘ তখন গভীর ঘুমে অচেতন। আধঘণ্টা পর্যন্ত এক ভাবে শুয়ে থেকে ডান পাশে ফিরল সে। এখন বাঘের পেছনের আরও খানিকটা নজরে এল করবেটের। আরো কয়েক মিনিট এভাবে শুয়ে থেকে হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল বাঘটা। বাঘটা নজরে আসার অপেক্ষায় রাইফেল হাতে তৈরি হয়ে বসে থাকলেন করবেট। মড়িটার কাছে যেতে হলে করবেটের কাছ দিয়েই যেতে হবে বাঘটাকে।

কয়েক মিনিট পেরিয়ে যাবার পর প্রায় একশ গজ দূরে একটা কাকর ভয়ার্ত গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে পাহাড় বেয়ে নেমে গেল। একটু পরে ওই দিকেই কোথাও ডেকে উঠল একটা শম্বর। অর্থাৎ আবার সরে পড়ল হারামী বাঘটা।

কিন্তু বাঘটা গেল কি করে বুঝতে পারলেন না করবেট। একটা বাঘের পক্ষে একদিনে যতটা পরিশ্রম করা সম্ভব তারচেয়ে বেশি সে করেছে, তারপরও করবেট যেখানে বসে আছেন সেদিকের সহজ পথ ছেড়ে সাংঘাতিক খাড়াই পথ বেয়ে ওটা উঠল কি করে! তবে এখন চলে গেলেও একটা ব্যাপারে করবেট নিশ্চিত, সেদিন দিন বা রাতের যে কোন সময় মড়ির কাছে একবার যাবেই বাঘটা। সুতরাং এখন আর চুপচাপ মাটিতে বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। তারচেয়ে মড়ির কাছাকাছি সুবিধে মত একটা গাছ খুঁজে নিয়ে তাতে চড়ে বসা উচিত ভেবে উঠে পড়লেন করবেট।

খুঁজতে খুঁজতে মড়িটার ডানে গজ দশেক দূরে একটা সুবিধামত ওক গাছ পেয়ে তাতে চড়ে বসলেন করবেট। সূর্য তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। যতদূর সম্ভব পশ্চিমের পাহাড় বেয়ে উঠে আসবে বাঘটা। গাছের ওপর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে উপত্যকাটা, ওপরের পাহাড়টাও। বিশাল একটা আগুনের গোলার রূপ নিয়ে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। দূর পাহাড়ের মাথায় বসে তখন শেষ রঙ ছড়াচ্ছে ওটা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হারিয়ে যাবে পাহাড়ের ওপারে, মুছে যাবে রঙের মেলা। এত তন্ময় হয়ে দৃশ্যটা দেখছিলেন

করবেট, যে হঠাৎ নিচের উপত্যকার শম্বরের ডাকে চমকে উঠে রাইফেলটা প্রায় ফেলেই দিচ্ছিলেন তিনি হাত থেকে। শম্বরের সতর্কবাণীর মানে হল, চলতে শুরু করেছে বাঘ। মড়ির কাছে পৌঁছতে যথেষ্ট সময় লাগবে তার। ততক্ষণ গুলি করার পক্ষে যথেষ্ট দিনের আলো থাকবে কিনা সন্দেহ।

দূর পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখলেন করবেট হারিয়ে গেছে সূর্য। ক্রমশঃ মুছে যাচ্ছে পশ্চিমাকাশের লালিমা। সাঁঝ হয়ে গেল, সাঁঝ গড়িয়ে রাত। কিন্তু তখনও এলো না বাঘটা। একটা দুটো করে তারা ফুটতে শুরু করেছে আকাশে। সেদিন ত্রয়োদশী, কয়েক মিনিট পরই উঠবে চাঁদ। তবে চাঁদ ওঠার আগে বাঘটা এলেও তারার আলোতেই তাকে দেখতে পাবেন করবেট। হিমালয়ের এদিকটায় তারার উজ্জ্বলতা একটু বেশিই। মড়ির গায়ের সাদা রং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওই উজ্জ্বল তারার আলোয়। মড়ির মাথাটা করবেটের দিকে ফেরানো। যদি লাশের পেছনের পা থেকে খেতে শুরু করে বাঘটা, তাহলে তাকে দেখতে না পেলেও মড়ির পেট সই করে গুলি করলে বাঘের গায়ে গুলি লাগার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, অবশ্য কথাটা সাধারণ বাঘের বেলায়ই খাটে। কিন্তু এ কয়দিন দেখেশুনে যা বুঝতে পেরেছেন করবেট, এটা সাধারণ বাঘ নয়, আর এটার কাজ কারবারও অন্যান্য বাঘের মত নয়। কাজেই অনিশ্চিত ভাবে গুলি করা ঠিক হবে না। আরো একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা আছে, যদি গুলিতে আহত হয় বাঘটা আর সেরে ওঠে, তাহলে মানুষখেকোও

হয়ে যেতে পারে। ওই প্রখর বুদ্ধিমান, সতর্ক আর প্রচণ্ড শক্তিশালী বাঘটা মানুষখেকোতে পরিণত হলে ওই এলাকা-টাকে মৃত্যুপুরী বানিয়ে ছাড়বে, এটা নিশ্চিত। সুতরাং ভাল মত না দেখে গুলি করা উচিত হবে না, ঠিক করলেন করবেট।

একটু পরই আলোর বন্যায় চারদিক প্লাবিত করে দিয়ে উঠে এল চাঁদ। বোধহয় এর জন্যেই অপেক্ষা করছিল বাঘটা। দেখতে না পেলেও অনুভব করছেন করবেট এসেছে সে। করবেটকে কি দেখতে পেয়েছে? মনে হয় না। কারণ গাছে উঠে বসার পর একটুও নড়াচড়া করেননি তিনি। আর অকারণে জঙ্গলের প্রত্যেকটা গাছ খুঁটিয়ে দেখে না বাঘ।

চাঁদের আলোয় সামনের এলাকাটা খুঁটিয়ে দেখলেন করবেট। তারপর মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকালেন, আছে ওখানে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে মাটিতে পড়া জ্যোৎস্নার আলোয় মড়িটার দিকে মুখ করে করবেটের কাছ থেকে মাত্র পনের ফুট দূরে বসে আছে বাঘটা, আর মাথা উঁচু করে করবেটকে দেখছে। করবেট ওর দিকে তাকাতেই কান দুটো খাড়া করে ফেলল বাঘটা। পেছনে মাথা ফেরানো অবস্থায়ই মূর্তি হয়ে গেলেন করবেট। তিনি স্থির হয়ে যেতেই কান নামিয়ে ফেলল বাঘটা। এখন কিছুই করার নেই করবেটের। এখন বাঘটাকে গুলি করতে হলে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে যেতে হবে করবেটকে, আর বাঘটার অলক্ষ্যে তা কিছুতেই করতে পারা যাবে না। অবশ্য বাঁ

কাঁধের ওপর দিয়ে গুলি চালানর চেষ্টা করা যায়। সে চেষ্টাই করে দেখলেন করবেট একবার। হাঁটুর ওপর রাখা রাইফেলটার মুখ বাঁ দিকে আছে তখন। অতি ধীরে হাঁটুর ওপর থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে মুখটা ডান দিকে ঘোরাতে শুরু করলেন তিনি। সাথে সাথেই আবার কান খাড়া করে করবেটের দিকে চাইল বাঘটা। তিনি রাইফেল ঘোরান বন্ধ করে দিতেই আবার কান নামিয়ে ফেলল বাঘ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার রাইফেলটা ঘোরাতে শুরু করতেই উঠে পড়ল বাঘটা, মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল পেছনের ঘন বনের ছায়ায়।

আবার করবেটকে হারিয়ে দিল বাঘটা। তিনি গাছে বসে থাকলে সেদিন আর আসবে না বাঘটা, এ ব্যাপারে নিশ্চিত করবেট। কিন্তু যদি চলে যান এখান থেকে তাহলে আসতেও পারে। এলেই মড়িটা সরিয়ে নিয়ে যাবে এখান থেকে। এতবড় একটা গরু কিছুতেই এক রাতে খেয়ে শেষ করতে পারবে না বাঘটা। বাকীটা খাবার জন্যে পরে হয়ত আরেকবার আসতে পারে আগামী দিন। তখন তাকে গুলি করার আর একটা সুযোগ পেয়েও যেতে পারেন করবেট।

কিন্তু রাতটা কোথায় কাটান যায় ভাবতে শুরু করলেন করবেট। রেস্ট হাউস থেকে বেরোনোর পর বিশ মাইল পথ হেঁটেছেন তিনি, আবার আট মাইল পথ হেঁটে রেস্ট হাউসে ফিরে যেতে মন চাইছে না। অন্য কোন এলাকা হলে মড়ি থেকে দুই তিনশ গজ দূরে গিয়ে মাটিতে শুয়ে

নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়তে পারতেন, কিন্তু এ এলাকায় একটা মানুষখেকো চিতা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর রাতেই শিকার করে মানুষখেকো চিতারা। সন্ধ্যায় গাছে বসে দূরে গরুর গলার ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন করবেট। কাছে-পিঠে কোন বাথান আছে নিশ্চয়ই। হিমালয়ের এসব এলাকায় গরু চুরি যায় না। কাজেই গরু চরানর জায়গার কাছেই কয়েকজন গরুর মালিক মিলে বাথান তৈরি করে।

বিকেলে শোনা ঘণ্টার শব্দ কোন্‌দিক থেকে এসেছিল তা মনে মনে আন্দাজ করে নিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লেন করবেট। অল্পক্ষণ চলার পরই পেয়ে গেলেন বাথানটা। একটা খোলা জায়গায় চারপাশে শক্ত করে বেড়া দিয়ে ঘেরা বাথানে প্রায় শ'খানেক গরু বাছুর রয়েছে।

জঙ্গলের প্রাণী মাত্রেই খুব সন্দেহপ্রবণ হয়, বিশেষ করে রাতের বেলা অপরিচিত অতিথি দেখলে তো বটেই। আর এই সন্দেহ প্রবণতার সাহায্যেই নিজেদের হিংস্র জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা করে ওরা। সুতরাং প্রথমেই গরুগুলোর সাথে ভাব করে নিতে হবে। ছেলেবেলায় কালাধুঙ্গীতে থাকাকালীন রাখালদের কাছ থেকে ও বিদ্যাটা ভালমতই রপ্ত করে নিয়েছিলেন করবেট। সে-কায়দায় অল্পক্ষণেই ভাব করে ফেললেন গরুগুলোর সাথে। তারপর রাইফেল থেকে গুলি বার করে বিচালি দিয়ে গুলিশূন্য রাইফেলটা ঢেকে রেখে বেড়া ডিঙিয়ে বাথানে ঢুকে পড়লেন তিনি। ভালমত বাছাই করে নিতে হবে শোবার জায়গা। কারণ রাতে হিংস্র

জানোয়ারের সাড়া পেলে ছুটোছুটি শুরু করবে গরুর দল, তখন তাদের মাঝখানে পড়াটা খুব আনন্দদায়ক হবে না।

খুঁজে পেতে একটা খুঁটির পাশে দুটো ঘুমন্ত গরুর মাঝখানে একটু খালি জায়গা দেখতে পেলেন করবেট। তেমন প্রয়োজন পড়লে খুঁটি বেয়ে চালায় উঠে যেতে পারবেন তিনি। শুয়ে থাকা গরুগুলোকে ডিঙিয়ে, দাঁড়ানো গরুগুলোর মাথা সরিয়ে ঘুমন্ত গরু দুটোর মাঝখানে গিয়ে শুয়ে পড়লেন করবেট। নিশ্চিন্তেই কেটে গেল রাতটা।

করবেটের ঘুম ভাঙল মানুষের গলার শব্দে। চোখ খুলে দেখলেন ভোরের কাঁচা রোদ এসে পড়েছে বাথানের ভেতর। দুধের পাত্র হাতে তাঁর দিকে অবাক চোখে চেয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন লোক। গতদিন নালাটায় পানি খাওয়ার পর থেকে পেটে আর কিছুই পড়েনি করবেটের। তাই লোকগুলোর হাতে দুধের পাত্র দেখে ক্ষুধাটা চেগিয়ে উঠল তাঁর।

করবেট কে এবং কেন এখানে রাত কাটিয়েছেন তা জানার পর ওরা তাঁকে সদ্য দোয়ানো গরুর দুধ খেতে দিল। অনেকক্ষণ অনাহারে থাকার পর করবেটের কাছে অমৃতের মত মনে হল ওই কাঁচা দুধ।

করবেটকে ওদের গ্রামে নিয়ে খাওয়ানোর আমন্ত্রণ জানাল লোকগুলো। সবিনয়ে ওদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে রেস্ট হাউসে ফিরে যাবার আগে একবার মড়িটাকে দেখতে চললেন করবেট। আগের জায়গায় তেমনি পড়ে আছে মড়িটা।

গত রাতে আর ফিরে আসেনি বাঘ। শকুনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে মড়িটাকে বাঁচাবার জন্যে ভাল করে পাতা আর ডাল-পালা দিয়ে ওটাকে ঢেকে রেস্ট হাউসে ফিরে এলেন করবেট।

করবেট দাবিধুরায় আসার পর চারদিন কেটে গেছে। একটা গরুখেকো বাঘের জন্যে আর এখানে অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না, ভাবলেন তিনি, তাই পরদিনই নৈনিতাল রওনা দেয়া ঠিক করলেন। রেস্ট হাউসের বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে বসে যাবার কথাটাই ভাবছিলেন তিনি, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'সেলাম, সাহেব।'

ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন করবেট। পেছনের সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। করবেট চাইতেই বলল লোকটা, 'বাঘে আমার একটা গরু মেরেছে, সাহেব। কথাটা জানাতে এলাম আপনাকে।'

বাঘটাকে মারার আর একটা সুযোগ এসেছে করবেটের হাতে। চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? আজ সফল হতে পারলে ভাল, না পারলেও অবশ্য কাল সকালে নৈনিতালে ফিরে যাবেন তিনি।

*

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর কয়েকজন লোককে সাথে করে বেরিয়ে পড়লেন করবেট। বার বার মানুষ আর ভালুকের খোঁচাখুঁচিতে বিরক্ত হয়ে জায়গা পালটেছে বাঘটা। গত দিন যেখানে মড়িটা ফেলে রেখেছিল বাঘ সেখান থেকে মাইল কয়েক দূরে দাবিধুরা পর্বতের পুবধারে এই গরুটা

মেরেছে সে। জমি এখানে সাংঘাতিক রকমের এবড়ো খেবড়ো। এদিক ওদিক ঘন ঝোপঝাড়ের মাঝখান থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দু'একটা ওক গাছ। চুকরদের (পাহাড়ী চড়াই) জন্যে এলাকাটা স্বর্গ বিশেষ। এমন জায়গায় বাঘটাকে মারতে পারার আশা কমই।

আড়াআড়ি ভাবে পাহাড়টার মুখে পড়ে আছে এক-টুকরো নিচু জমি। জমিটার একপ্রান্ত ঝোপঝাড়ে ঠাসা। ওই রকম একটা ঝোপের কাছেই মারা পড়েছে গরুটা। গরুটাকে ঝোপের কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে টেনে নিয়ে খোলা জায়গায় ফেলে রাখা হয়েছে। জমিটার উল্টো দিকে পাহাড়ের ঢালুতে একটা বিশাল ওক গাছ দাঁড়িয়ে। চার-দিকে একশ গজের মধ্যে ওই একটি মাত্র ওক গাছ, ওতেই বসা ঠিক করলেন করবেট। মাঠের দিকে ঝুঁকে আছে গাছটা। ঝুঁকে থাকায় গাছের কাণ্ডের ওপর অনেকগুলো ছোট ছোট ডালপালা জন্মেছে। এসব ডালপালার সহায়তায় সহজেই গাছে উঠে বসলেন করবেট। কিন্তু চোখের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল কাণ্ডটা। আরও কয়েক ফুট ওপরে উঠে একটা সুবিধে মত ডাল পেয়ে গিয়ে ওতেই বসা ঠিক করে চা খেতে নিচে নেমে এলেন করবেট। তিনি জায়গাটা ঘুরে দেখছেন, ওদিকে ষ্টোভ জ্বালিয়ে চা তৈরি করে ফেলল তার লোকেরা।

বিকেলে চারটের দিকে লোকজনদের পাহাড়ের ওপারের একটা গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে গাছে উঠে তৈরি হয়ে বসলেন

করবেট। তাঁর গাছটা থেকে দশ গজ দূরে খোলা জায়গায় পড়ে আছে মড়িটা। মড়িটার গজখানেক পেছনে একটা ঘন ঝোপ। চুপচাপ বসে বসে সামনের একটা ঝোপে লালঝুঁটি বুলবুলিদের বুনো ফল খাওয়া দেখ লেন করবেট। প্রায় একঘন্টা পর হঠাৎ মড়ির পেছনের ঝোপটার ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন করবেট। স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে চেয়েই হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসছে বাঘটা। কি করে ঝোপটাকে বিন্দুমাত্র না নাড়িয়ে ওটার ভেতর ঢুকল ওটা বুঝতে পারলেন না করবেট। আস্তে করে সামনের একটা থাবা বাড়িয়ে দিল বাঘটা, তারপর আর একটা। কয়েক সেকেণ্ড সেভাবেই পড়ে থেকে অতি ধীরে ক্রল করে করে মড়ির দিকে এগিয়ে এল সে। মড়ির কাছে পৌঁছে চুপচাপ মাটিতে পড়ে থাকল আরও কয়েক সেকেণ্ড। তারপর করবেটের চোখ থেকে চোখ না সরিয়েই আস্তে করে মরা গরুর লেজটা কামড়ে ধরল। তখনও করবেট কিছু করছেন না দেখে বোধ হয় সাহস পেল বাঘটা, অথবা তিন দিন আগে ভালুকটার সাথে লড়াইয়ের পর পেটে কিছু পড়েনি বলেই ক্ষুধার তাড়নায় বেপরোয়া হয়ে বাচ্চা ছেলের আপেল খাওয়ার মত করে বড় বড় কামড়ে মড়িটার পেছনের ছাল সুদ্ধ গোশত খেতে শুরু করল।

বাঘের দিকে মুখ করে করবেটের দু'হাঁটুর ওপর শোয়ান আছে রাইফেলটা, এখন সেটা শুধু কাঁধে তুলে নিতে পারলেই হল। মুহূর্তের জন্যে বাঘটা তার ওপর থেকে চোখ সরালেই

কাজটা করে নিতে পারবেন তিনি। কিন্তু বিপদ সম্পর্কে একটু বেশি রকমই হুঁশিয়ার বাঘটা, করবেটকে সেই এক মুহূর্ত সুযোগ দিতেও সে নারাজ। তাড়াহুড়া না করে সমানে খেয়ে চলল সে। একটু পর বাঘটার পেছনের ঝোপটার ওপর কোত্থেকে যেন উড়ে এসে বসল একজোড়া কালো গলাওয়ালা ফিঙে। কোন রহস্যময় কারণে যেন ফিঙেগুলোকে দেখেই বুনো ফলের ঝোপ থেকে বুলবুলিগুলো উড়ে গেল সেদিকে। ঝোপের ওপর বসে লাফাতে লাফাতে তুমুল চেঁচামেচি জুড়ে দিল পাখীগুলো। ওদের গোলমালে করবেটের ওপর থেকে যেন একটু মনোযোগ হারাল বাঘটা। সেই সুযোগে কাঁধে তুলতে গেলেন করবেট রাইফেলটা। সাথে সাথেই স্প্রিঙের মত লাফ মেরে পেছনে সরে গিয়ে ঝোপে ঢুকে পড়ল বাঘটা। রাইফেলটা কাঁধে তুলে ডান হাতের কনুইটা হাঁটুর ওপর রেখে দ্বিতীয়বার বাঘটার মাথা বের করার অপেক্ষায় বসে রইলেন করবেট।

কয়েক মিনিট কেটে যাবার পর করবেটের গাছটার নিচ থেকে হঠাৎ একটা গ-র-র-র আওয়াজ শুনে চমকে সেদিকে চাইলেন তিনি। কতগুলো ছোট ছোট ডালপাতা চোখের সামনে বাধা হয়ে থাকায় পরিষ্কার দেখতে পেলেন না করবেট কিছু। কিন্তু বুঝতে পারলেন তাঁর পেছন থেকে প্রচণ্ড জোরে গাছটাকে আঁচড়াতে আঁচড়াতে গর্জাচ্ছে বাঘটা। করবেটের চোখ এড়িয়ে কি করে গাছের গোড়ায় এল বাঘটা? সে এক আশ্চর্য ব্যাপার!

বাঘটাকে গুলি করতে হলে পুরো একশ আশি ডিগ্রী ঘুরতে হবে এখন করবেটকে। কিন্তু কোনমতেই তা করা এখন সম্ভব হবে না। অগত্যা ডালে বসে বসে নিঃশব্দে আঙ্গুল চোষা ছাড়া আর কিছুই করার নেই করবেটের।

শুধু কাক আর বানরেরাই সাধারণত মজা করে থাকে মানুষের সাথে। কিন্তু বাঘও এ ব্যাপারে পেছপা নয় সে-দিন জানলেন করবেট। তবে ওই বিশেষ বাঘটির স্বভাব চরিত্র আর সব বাঘেদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, গত পাঁচ দিনে এটা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন করবেট।

গত পাঁচদিনে চারটি গরু মেরেছে ওই হারামী বাঘটা এবং চারটিই মেরেছে প্রকাশ্য দিবালোকে। কিন্তু তার ঔদ্ধত্য সেদিন যেন সীমা ছাড়িয়ে গেল। প্রায় আধঘণ্টা ধরে গুলি করার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে সেদিন করবেটের চোখের সামনে গরু খেয়েছে বাঘটা, তারপর তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করার জন্যেই যেন তিনি যে গাছটায় বসে আছেন সেটাকে এসে আঁচড়াচ্ছে। কিন্তু তাঁকে অবজ্ঞা করে মজা পেতে দেবেন না তিনি বাঘটাকে। তাই রাইফেলটা হাঁটুর ওপর নামিয়ে রেখে দু'হাত জড়ো করে মুখের সামনে এনে প্রচণ্ড জোরে এক হাঁক ছাড়লেন তিনি। হাঁকের শব্দ চারপাশের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চতুর্গুণ বেড়ে গেল। আর সেই শব্দে ভয় পেয়ে লেজ তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল বাঘটা, একছুটে পাহাড় বেয়ে উঠে নেমে গেল ওপাশে। তার পরদিনই নৈনিতাল ফিরে এলেন করবেট। এরপর

বহুবার দাবিধুরায় গেছেন তিনি, অনেক মানুষখেকোও শিকার করেছেন। কিন্তু ঐ বাঘটিকে, কিছুতেই মারতে পারেননি, কেউ মারতে পেরেছে বলেও শোনেননি। আর করবেটের সাথে কখনও দেখা হয়নি বাঘটার। বোধহয় কালের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া বৃদ্ধ সৈনিকের মতই হারিয়ে গেছে ঐ সাহসী যোদ্ধা—মন্দিরের বাঘটিও।

সঙ্গম-চিতা

একান ওকান হতে হতে ব্যাংগালোরে এনডারসনের বাড়িতেও গিয়ে পৌঁছল খবরটা। ব্যাংগালোর শহরের সত্তর মাইল দক্ষিণে নাকি মানুষ মেরে বেড়াচ্ছে একটা চিতা।

দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চলে তখন মানুষখেকো চিতার কথা খুব কমই শোনা যেত। কারণ চিতার বাসোপযোগী ঘন জঙ্গল ছিল না এখানে, পরিবর্তে বিশাল সব পর্বতের সারি চলে গিয়েছে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত। এর ব্যতিক্রমও অবশ্য ছিল। যেমন, পশ্চিমঘাট পর্বতের পাদদেশের চারশ' মাইল বিস্তৃত ও গড়ে দশ থেকে পনের মাইল চওড়া এক গভীর জঙ্গল। এছাড়া ওই অঞ্চলের অন্যান্য সব পর্বতের পাদদেশে জঙ্গল বলতে গেলে প্রায় ছিলই না। জঙ্গল না থাকলে হরিণ, শূয়োর ইত্যাদি প্রাণীর বাসও থাকে না। স্বাভাবিক ভাবেই ওইসব এলাকায় মাংসাশী প্রাণী যেমন বাঘ বা চিতা থেকে থাকলে তারা গৃহপালিত পশুর দিকে

ঝুঁকবে। গৃহপালিত পশু গরু-ছাগল ছাড়াও আর একটা প্রাণীর প্রতি বিশেষ লোভ আছে চিতার, সেটা কুকুর। লোকালয়ের আশপাশে থাকলে খাবার জন্যে প্রচুর কুকুরের মাংস জোগাড় করে ফেলতে পারে চিতা। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় পার্বত্য অঞ্চলে সে সময়ে মনুষ্য বসতির সংখ্যাও খুব কমে গিয়েছিল। এর কারণ, নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো ছিলই, তার ওপর ছিল জলাতংক রোগের প্রাবল্য। এক সময়ে এসব এলাকায় নেড়ি কুত্তার সংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছিল। প্রায়ই, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে, পাগল হয়ে যেত একটা কি দুটো কুকুর। স্বজাতীয়দের কামড়ে কামড়ে পাগলা কুকুরের সংখ্যা বাড়িয়েই চলত এরা। এই সব পাগলা কুকুরের কামড়ে জলাতংক রোগ ছড়িয়ে পড়ত মানুষের মধ্যে। হাইড্রোফোবিয়া ভ্যাকসিনের অভাবে এদের মধ্যে প্রায় সব ক'জন রোগীই মারা যেত। ভয়ে শেষ পর্যন্ত এসব এলাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করল লোকে। মানুষের আরও একটা বড় শত্রু ছিল ওই সব অঞ্চলে। বানর। খেতের ফসল পাকতে শুরু করলেই তার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত বিশাল বানর বাহিনী, মাইলের পর মাইল ফসলের খেত অল্প সময়ের মধ্যেই একেবারে ধ্বংস করে দিত। যা খেত তার চেয়ে ঢের বেশি নষ্ট করত তারা। ফলের গাছগুলোর ব্যাপারেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এদিকে এতসব ক্ষতি করার পরও কিন্তু বানরের গায়ে হাত তুলতে সাহস পেত না তারা। কারণ রাম-রাবনের যুদ্ধের পর থেকেই বানরকে পবিত্র

জানোয়ার হিসেবে মেনে এসেছে হিন্দুরা। একদিকে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যদিকে অপবিত্র কুকুর আর পবিত্র বানর মিলে দুঃসহ করে তুলেছিল ওইসব এলাকার জনজীবন। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে 'দুত্তোরি ছাই' বলে ওখান থেকে পাততাড়ি গুটাতে শুরু করল লোকে। তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক মাতৃভূমির মায়া ছাড়তে পারল না, পড়ে থাকল মাটি আঁকড়ে। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে চিতা ইত্যাদি মাংসাশী প্রাণীরাও সরে পড়তে শুরু করল ওই এলাকা ছেড়ে। চলে গেল তারা পশ্চিমঘাট পর্বতের পাদদেশের গভীর জঙ্গলে, স্বাভাবিক খাদ্যের সংস্থান সেখানে প্রচুর। কিন্তু সেখানেও টিকতে পারল না তারা। কারণ পশ্চিমঘাট এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ একশ' ইঞ্চিরও বেশি। এর ফলে বড় বড় গাছ আর ঘন হয়ে জন্মানো বাঁশ গাছে ঠাসা এখানকার জঙ্গল। জঙ্গলের মাঝে মাঝে একআধটু ফাঁকা জায়গায় পচা ডোবার পাড় ঘিরে জন্মে আছে লম্বা লম্বা ঘাস। এলাকাটাকে মশা-মাছি, টিক, জোঁক ইত্যাদির স্বর্গভূমি বললেও চলে। অতি বৃষ্টি পছন্দ করে না চিতারা, আর ওই সব পোকা-মাকড়ের কোনটাকেই দেখতে পারে না দু'চক্ষে। অতএব জায়গা ছাড়তে হল তাদের। চলে গেল অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডা অঞ্চলের দিকে। কাজেই ব্যাংগালোরে বসে সংগম এলাকায় মানুষখেকো চিতার আবির্ভাবের কথা শুনে একটু অবাকই হলেন এনডারসন।

প্রথমে কথাটা বিশ্বাসই করলেন না এনডারসন।

কারণ, ওই সব এলাকার লোকের তিলকে তাল করার স্বভাবটা তাঁর জানা। তিলকে তাল করতে অবশ্য আমরাও কম যাই না, কিন্তু ওই এলাকার লোকেরা আমাদেরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল কয়েকগুণ, কিংবা ওদের কাছ থেকেই পুরুষানুক্রমে কোন না কোন উপায়ে এই অভ্যাসটা রপ্ত করেছি আমরা। কেনেথ এনডারসনের নিজের জবানীতেই এ সম্পর্কে দু'একটা কথা শুনুন, 'হিমালয়ের পাদদেশের পাহাড়ী লোকেদের তিলকে তাল করার স্বভাবটা ধরতে গেলে প্রায় ঠকে শিখেছি আমি। যদি তারা বলত কাউকে বাঘে মেরেছে, গিয়ে হয়ত দেখেছি লোকটা মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে ঠিকই তবে মারা যায়নি। যদি বলত মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে, গিয়ে দেখেছি সামান্য আঁচড় লেগেছে মাত্র তার গায়ে। আর যদি বলত আঁচড় লেগেছে, তাহলে হয়ত দেখা যেত তার থেকে দশ হাত দূরে দিয়ে চলে গেছে বাঘ। এহেন অবস্থায় কোন্‌টা যে বিশ্বাস করব আর কোন্‌টা করব না, ভেবে ঠিক করতে পারতাম না।' বিখ্যাত শিকারী জিম করবেটেরও বহুবার হয়েছিল এই অভিজ্ঞতা।

তাই প্রথম যখন শুনলেন এনডারসন, সংগম এলাকায় একটা মেয়েলোককে চিতাবাঘে মেরেছে, কথাটা বিশ্বাস করলেন না তিনি। এমন কি পরে একটা বাচ্চাকে চিতায় খেয়েছে শুনেও না। তৃতীয়বার একটা লোককে খুন করল চিতাটা, কিন্তু তবুও গুরুত্ব দিলেন না তিনি। চতুর্থ লোকটা খুন হওয়ার পর খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ফলাও

করে ছাপা হল সংবাদটা। এবারে আর অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই, কাজেই রওনা দেবার কথা ভাবতে শুরু করলেন এনডারসন।

ব্যাংগালোর, মহীশূর এবং মাদ্রাজ থেকে চিতাটাকে মারতে সংগমে ছুটে গেল বহু শিকারী। একটা চিতা মারলও একজন। তারপর থেকে মাসখানেক পর্যন্ত ওই এলাকায় আর কোন মানুষ মারা গেল না চিতার আক্রমণে। এতে লোকের বিশ্বাস জন্মাল, প্রকৃত মানুষখেকোটাই মারা পড়েছে। একে একে নিজ নিজ শহরে ফিরে এল শিকারীরা।

এরপর আবার মানুষ মারল চিতাটা, কিন্তু খেতে পারল না তার শিকারকে। একটা ছাউনি মত ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল এই হতভাগ্য লোকটা, পাশেই ঘুমোচ্ছিল তার চারটে দো-আঁশলা কুকুর—খরগোশ এবং মাঝে মধ্যে হরিণ শিকারের কাজে লোকটাকে সাহায্য করত ওগুলো। কতকগুলো পুরোনো টিন দিয়ে চাল দেয়া হয়েছে এই ঘরটার, বেড়া দেয়া হয়েছে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে। ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবে মাটিতে পোঁতা কঞ্চিগুলোর মাঝের ফাঁক বন্ধ করার জন্যে বেড়ার বাইরের দিকটায় পাতার আচ্ছাদন দেয়া হয়েছে। পাতার আচ্ছাদনের ওপর আবার কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার মত করে আটকে দেয়া হয়েছে কাঁটালতা। মোটা বাঁশের কঞ্চি বুনে বুনে তৈরি হয়েছে ঘরের একমাত্র দরজার পাল্লা। এটাতেও শক্ত করে আটকে দেয়া হয়েছে কাঁটালতা। রাতের বেলা দরজার পাল্লা লাগিয়ে ভেতর থেকে শক্ত করে আটকে

দেয়া হয় মোটা বাঁশের লাঠি দিয়ে।

সেদিন রাতে এসে দরজার একদিকে থাবা দিয়ে টেনে ফাঁক করে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে চিতাটা। চিতাটার আগমন টের পেয়ে আতংকিত হয়ে জোরে জোরে চেঁচাতে শুরু করে কুকুরগুলো। কুকুরের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যায় লোকটার, কিন্তু সে কিছু করার আগেই ঘরে ঢুকে পড়ল চিতাটা। অবশ্য নিরস্ত্র অবস্থায় কিছু করারও ছিল না লোকটার।

চিতাটা ঘরে ঢুকতেই এক কোণে সরে গেল কুকুরগুলো, গা ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়াল পরস্পরের। তাদের দিকে তাকিয়ে একবার মুখ খিস্তি করল খুনীটা, তারপর সোজা এগিয়ে গিয়ে কামড়ে ধরল ভীত চকিত লোকটার গলা। একবার মাত্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠেই মারা গেল লোকটা।

কুকুরের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল লোকটার পড়শী-দেরও। ব্যাপার কি ভেবে আশ্চর্য হলেও তা তদন্ত করে দেখার জন্যে ঘর থেকে বেরোল না কেউ। লোকটাকে খুন করার পর লাশটাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাবার কাজে মন দিল চিতাটা। যে ফাঁকটুকু দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছিল সেখান দিয়েই লাশটাকে বের করে নিয়ে যেতে গিয়ে দেখল সে, বের করা যাচ্ছে না ওটা। তাই লাশটাকে দরজার ফাঁকের কাছে রেখে বাইরে বেরিয়ে এল চিতাটা। বাইরে থেকেই লোকটার গলা কামড়ে ধরে বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করল, কিন্তু একটুখানি বেরিয়েই কাঁটালতায় আটকে

গেল লাশটা। গিয়ে দরজার একপাশের বেড়া ভেঙে ফেলার চেষ্টা করল সে। প্রচণ্ড টানাটানি করে বেড়া কিছুটা স্থানচ্যুত করতে পারল চিতাটা। এতে আশান্বিত হয়ে দ্বিগুণ শক্তিতে বেড়া ভাঙার কাজে মন দিল সে। এতে শেষ পর্যন্ত ভেঙে গেল একপাশের বেড়া, আর ভারসাম্য হারিয়ে দরজাটা এসে পড়ল একেবারে চিতাটার পিঠের ওপর। এই নতুন শত্রু সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না মানুষখেকোটার, ভয় পেয়ে লেজ তুলে ভোঁ দৌড় দিল সে। লাশটা পড়ে থাকল ভাঙা দরজার কাছেই।

বেড়া ভাঙা আর দরজা পড়ার শব্দ হতেই অনেক কিছু আন্দাজ করে ফেলল পড়শীরা। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সারাটা গাঁয়ের লোকজনকে জাগিয়ে তুলল তারা। একটু পরেই প্রাচীন গাদা বন্দুক, লগুড় (একদিক মোটা খাটো লাঠি), লম্বা পাকা বাঁশের লাঠি ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, হাতে কেরোসিনের লণ্ঠন ঝুলিয়ে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখতে রওনা হল কয়েকজন অতি সাহসী লোক। মৃত লোকটাকে দেখেই নিশ্চিত হল ওরা, কাজটা চিতার।

আবার আতংক ছড়িয়ে পড়ল গোটা এলাকায়। চিতাটার কার্যকলাপ সম্পর্কে নতুন নতুন ভয়াবহ, রোমাঞ্চকর সব কাহিনী তৈরি হতে শুরু করল, ছড়িয়ে পড়ল তা দূর থেকে দূরে। সংগম এলাকার এক গাঁয়ের মোড়লের মুখেই খবরটা শুনলেন এনডারসন। খবরটা তাঁর কাছে পৌঁছানোর জন্যেই গাঁটের পয়সা খরচ করে ব্যাংগালোরে এসেছিল মোড়ল।

খবর পেয়ে অফিস থেকে শুক্র, শনি—দু'দিনের ছুটি নিলেন এনডারসন। রবিবার সাধারণ সরকারী ছুটির দিন হওয়ায় হাতে মোট তিনদিন সময় পেলেন। এই তিন দিনের মধ্যেই চিতাটাকে মারার পরিকল্পনা করে মোড়লকে সংগে নিয়ে সংগম রওনা হলেন তিনি।

ব্যাংগালোর থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে কানকানহালি শহরের ওপর দিয়ে সংগমের দিকে চলে গেছে একটা রাস্তা। কানকানহালি ছাড়িয়ে মোড় নিয়ে কাবেরী নদীর ধার ধরে ধরে চলে গেছে রাস্তাটা। শেষ তিন মাইল রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। এই রাস্তায় পড়েই তীক্ষ্ণ ক্যাঁচকোঁচ শব্দে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করল এনডারসনের স্টুডিবেকার গাড়িটার প্রত্যেকটি জয়েন্ট। অত্যন্ত সতর্ক হয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে এনডারসনকে। মাঝে মাঝেই তীক্ষ্ণ মোড় নিয়েছে রাস্তাটা, এর দু'পাশেই গভীর খাদ। নিজে গলদঘর্ম হয়ে আর স্টুডিবেকারটার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছুলেন তিনি সংগমের সরকারী ডাক বাংলোয়।

'সংগম' শব্দের অর্থ মিলন। কাবেরী আর আরক্রাভারতী Arkravarthy এই দুটো নদী এখানে এসে মিলিত হয়েছে বলেই বোধহয় জায়গাটার ওই রকম নামকরণ করা হয়েছে। পুব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত ইচ্ছে এখানে কাবেরী নদী। কাবেরীর উত্তর পাড়ে, মহীশূর রাজ্যের সীমানার কাছাকাছি পড়েছে সংগম এলাকা। কাবেরীর দক্ষিণ পাড়ে উত্তর কয়েম্বাটুর জেলার গভীর জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা (কোল্লে-

গাল ফরেস্ট ডিভিশন)।

সংগম এবং তার আশপাশের এলাকাগুলোকে শিকারীদের স্বর্গ বললেই চলে। এখানে কাবেরী নদীর যে কোন তীরে কিংবা কিনারের অল্প পানিতে পড়ে থাকা বড় বড় পাথরে দাঁড়িয়ে গুলি করে কুমির মারা যায়, ছিপ ফেলে ধরা যায় প্রচুর মহাশের মাছ। ওদিকে মহীশূরের জঙ্গলে আছে অসংখ্য চিতল হরিণ, শম্বর, কাঁকর, বুনোশূয়োর, ময়ূর, বন-মোরগ ইত্যাদি। ভালুক, চিতা বা বাঘও দেখা যায় মাঝে মধ্যে। ওপারের কয়েম্বাটুরের জঙ্গল থেকে প্রায়ই নদী পেরিয়ে এপারে চলে আসে হাতীর পাল। বেশ কিছু বিশাল আকারের বাইসনও বাস করে এখানকার জঙ্গলে।

বাংলোর একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল মুখী গাছটার নিচে গাড়ি পার্ক করে রেখে গাঁয়ের দিকে রওনা দিলেন এনডারসন। কুকুরের মালিককে যেখানে মেরেছিল চিতাটা সেখানটা পরিদর্শন করে, সে-রাতে সত্যি সত্যি কি ঘটেছিল তা জানতে চাইলেন আশপাশের লোকের কাছে। ব্যাংগালোরে মোড়লের মুখে শোনা কথারই পুনরাবৃত্তি শুনলেন তিনি এখানকার লোকের মুখেও।

নানা ভাবে প্রশ্ন করে করে সব কথা জেনে নিয়ে এনডারসনের ধারণা হল এই বিশেষ চিতাটাকে মারা বেশ কঠিন কাজ হবে। সংগম, মহীশূর এবং নদীর ওপারের কয়েম্বাটুর জঙ্গলের বিস্তীর্ণ এলাকায় মানুষখেকোটাকে খুঁজে বেড়ানো খড়ের গাদায় সূঁচ খুঁজে বেড়ানোরই সামিল। অবশ্য

আশার কথা, বড় নদী সাঁতরাতে পছন্দ করে না চিতা (বাঘ কিন্তু ঠিক এর উল্টো), তবু নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না কিছুই।

চিতাটাকে কাছে আনার জন্যে প্রথমেই টোপ বাঁধার কথা মনে হল এনডারসনের। মোড়লের সক্রিয় সাহায্যে পাঁচটা বাচ্চা ষাঁড় কিনে ফেললেন তিনি। প্রথমে একটা বাচ্চাকে বাংলো থেকে আধ মাইল পশ্চিমে বেঁধে রেখে এলেন, নদীর তীর থেকেও জায়গাটার দূরত্ব সমান। নদীর তীর ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে প্রথম বাচ্চাটার প্রায় মাইলখানেক দূরে বাঁধলেন দ্বিতীয় বাচ্চাটা ; তৃতীয়টা দ্বিতীয়টার মাইলখানেক পশ্চিমে। চতুর্থটা বাঁধলেন আরক্রাভারতীর একটা উপনদীর মোহনায়। জায়গাটা বাংলো এবং কাবেরী নদীর তীর থেকে সমান দূরত্বে অবস্থিত। পঞ্চম এবং শেষ বাচ্চাটা বাঁধলেন চতুর্থটার এক মাইল পুবে। মোটামুটি একই সরল রেখায় থাকল পাঁচটা টোপ। সব ক'টারই অবস্থান নদীর তীর থেকে আধ মাইল ভেতরে। পুবের প্রথম টোপটা থেকে পশ্চিমের শেষ টোপটার দূরত্ব হল চার মাইলের মত।

সূর্য ডোবার পূর্ব মুহূর্তে ডাক-বাংলোয় ফিরে এলেন এনডারসন। বাংলোর ছোট্ট বারান্দায় বসে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে দুই মগ ধূমায়িত চা গলাধঃকরণ করলেন তিনি। তারপর পাইপ ধরিয়ে বাংলোর দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে চুপচাপ শুনতে লাগলেন পাথুরে তীরে আছড়ে পড়া নদীর পানির মৃদু কলতান। রাতটা অন্ধকার, আকাশও মেঘলা। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকফোকর

দিয়ে মাঝে মধ্যে উঁকি মারছে এক আধটা তারা। এই অন্ধকারে টোপের ওপর ওৎ পেতে বসে চিতার অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। তাই ঘুমোতে চললেন এনডারসন।

পরদিন খুব ভোরে উঠে টোপগুলো পরিদর্শন করতে চললেন এনডারসন। বহাল তবিয়তে জ্যান্ত অবস্থায়ই পেলেন তিনি সব ক'টা টোপকে। গতদিন যে পথ ধরে এসেছিলেন সেই পথ ধরেই নদীর উজান বরাবর হাঁটতে হাঁটতে একটা তীক্ষ্ণ মোড় পেরিয়ে একেবারে ফেরিঘাটের কাছে চলে এলেন তিনি। এতটা পথের মাঝে কোথাও চিতার পায়ের ছাপ চোখে পড়ল না তাঁর। শুধু গোটা কয়েক চিতল এবং তিনটে শম্বর হরিণ রাতের বেলা আড়া-আড়ি ভাবে পথ পেরিয়ে গিয়ে নদী থেকে পানি খেয়ে আবার ফিরে গেছে জঙ্গলে।

এবার বাংলোয় ফেরার পালা। সোজা রাস্তায় না গিয়ে কোণাকুণি ভাবে পাহাড় পেরিয়ে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলে আরক্রাভারতীর বালুকাবেলায় এসে দাঁড়ালেন এনডারসন। আশা করেছিলেন এদিকের কোথাও পাওয়া যাবে চিতার পায়ের ছাপ, কিন্তু নিরাশ হতে হল তাঁকে। আগের সেই ক'টা চিতল আর শম্বরের ছাপই পাওয়া গেল এখানেও, চার নম্বর টোপটা পেরিয়ে আরক্রাভারতী আর কাবেরীর সংগমস্থলের দিকে চলে গেছে হরিণের দলটা।

তিনদিন ছুটির দেড় দিন পেরিয়ে গেছে, অথচ এর মাঝে চিতাটার পায়ের ছাপও চোখে পড়ল না এনডারসনের।

অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে পড়লেন তিনি।

দুপুরের খাওয়ার পর একটু পুবে ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এনডারসন। কাবেরীর ভাটির দিকে চলতে চলতে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরের একটা গিরি-খাতের কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। সরু হতে হতে নদীটা এখানে বিশ ফুটে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশাল গিরি-গহ্বরের ভেতর দিয়ে সগর্জনে বয়ে চলেছে নদীর পানি, স্থানীয় লোকেরা নাম দিয়েছে এর 'মিকি-দাত'। এই কানাড়ী শব্দটার বাংলা মানে হল 'ছাগলের লাফ'। জায়গাটার এরকম অদ্ভুত নামকরণের কারণ হল, বহুদিন আগে নাকি একটা পাহাড়ী ছাগল জঙ্গলী কুকুরের তাড়া খেয়ে ছুটে এসে আর কোন উপায় না দেখে এক লাফে বিশ ফুট চওড়া নদী পেরিয়ে ওপারের মহীশূরের সীমানায় গিয়ে পড়ে। কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও স্থানীয় লোকেরা বার বার হলপ করে তা বাইরে থেকে আগত ভ্রমণকারীকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করে।

চক্রাকারে পাক খেয়ে খেয়ে গহ্বরের এক মুখ দিয়ে ঢুকে অন্য মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ফেনায়িত জলরাশি। পানির গর্জনে চাপা পড়ে যাচ্ছে এখানে আশপাশের অন্যান্য শব্দ, এমন কি প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠলেও নিজেই নিজের চিৎকার শুনতে পায় না মানুষ।

একটা পাথরের ওপর বসে বসে দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলেন এনডারসন। আরও একশ গজ ভাটির দিকে

নদীর পানি অনেকটা শান্ত। সেই শান্ত পানির বুকে আলোড়ন তুলে মাঝে মাঝেই শূন্যে লাফিয়ে উঠছে মহাশের মাছ। ওপরের পরিষ্কার নীল আকাশে চক্কর মারছে একটা মেছো চিল। তক্কে তক্কে আছে সে, সুযোগ পেলেই ছোঁ মেরে পানি থেকে তুলে নেবে একটা মাছ। বেশ কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়িয়ে বাংলোর দিকে রওনা দিলেন এনডারসন। এ পথেও কোথাও চিতাটার পায়ের ছাপ চোখে পড়ল না তাঁর।

রাতটা পরিষ্কার। যদিও চাঁদ নেই আকাশে, তবু গত রাতের মত মেঘ না থাকায় তারার আবছা আলো ছড়িয়ে পড়েছে বনভূমির ওপর। সে-আলোয় কয়েক গজ দূরের কোন জিনিসের অবয়ব সহজেই ঠাহর করা যায়।

কি করে চিতাটার সন্ধান পাওয়া যায় ভাবতে লাগলেন এনডারসন। তাঁর তিন দিন ছুটির দু'দিন ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গেছে, অথচ চিতাটা সম্পর্কে যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই আছেন এখনও। ভাবতে ভাবতেই ডাক বাংলোর কেয়ারটেকারের কুকুরটার কথা মনে পড়ল এনডারসনের। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন তিনি, মাঝরাত পর্যন্ত কুকুরটাকে ধার চাইলেন কেয়ারটেকারের কাছে। প্রথমে রাজী হতে চাইল না কেয়ারটেকার, কিন্তু তিনটে টাকা হাত বদল হয়ে যেতেই আর অমত করল না।

দিনের বেলায়ই বাংলো থেকে মাইলখানেক দূরে একটা বিশাল পাথর চোখে পড়েছিল এনডারসনের, কুকুরটাকে নিয়ে

সেই দিকেই চললেন তিনি। ওখানে পৌঁছে পাথরের পাদদেশে একটা চারাগাছের গায়ে কুকুরটাকে বেঁধে রেখে হাঁটতে শুরু করলেন নদীর ভাটির দিকে। বেশ কিছুদূর এসে যখন বুঝলেন কুকুরটা আর দেখতে পাচ্ছে না তাঁকে, ডান পাশ ঘুরে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘুর পথে আবার পাথরটার দিকে রওনা হলেন তিনি। কুকুরটা যেদিকে বাঁধা আছে তার উল্টো দিক দিয়ে পাথরটার কাছে পৌঁছে তাতে চড়ে শুয়ে পড়লেন উপুড় হয়ে। সারা দিনের প্রখর রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত হয়ে ওঠা পাথরটা ঠাণ্ডা হয়নি তখনও।

জঙ্গলের মধ্যে তাকে একাকী ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে ভেবে চেঁচাতে শুরু করেছে কুকুরটা। মাঝে মাঝেই শ্রান্ত হয়ে যাওয়ার ফলে গলার স্বর নিচু পর্দায় নেমে আসছে ওটার, থেমে যাচ্ছে; কয়েক মিনিটের বিরাম নিয়েই আবার শুরু করছে নতুন উদ্যমে। ব্যাপারটা অত্যন্ত খারাপ লাগছে এনডারসনের। কুকুরটাকে চিতার টোপ হিসেবে বেঁধে রাখতে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না তাঁর মন। গরু-ছাগলের চেয়ে অনেক অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে কুকুর। টোপ হিসেবে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে এটা না বুঝলেও ভয়ংকর বিপদে আছে এটুকু বোঝার বুদ্ধি তার আছে। কাজেই সাংঘাতিক মানসিক কষ্টের ভেতর রয়েছে বেচারা। একবার একটা কুকুরকে চিতার টোপ হিসেবে বেঁধে রেখে তার ওপর বসে রাত কাটিয়েছিলেন এনডারসন। সারা রাতে একবারও দর্শন দিল না চিতা, কুকুরটাও অক্ষত থাকল, কিন্তু পরদিন

সকালেই অসুখে পড়ল ওটা এবং মারা গেল সাত দিনের মধ্যেই। সাংঘাতিক স্নায়বিক উত্তেজনাই মৃত্যুর কারণ হয়েছিল হতভাগ্য প্রাণীটার। সেই থেকে পারতপক্ষে কুকুরকে চিতার টোপ হিসেবে ব্যবহার করতেন না এনডারসন। নিতান্ত বাধ্য না হলে এবং হাতে সময় থাকলে এই কুকুরটাকেও এভাবে কাজে লাগাবার কথা মনে আসত না তাঁর।

পাথরের চূড়ায় শুয়ে শুয়ে চারপাশে নজর রাখতে লাগলেন এনডারসন। প্রায় ঘণ্টাখানেক অতিবাহিত হবার পর বাংলোয় যাবার পথ বেয়ে একটা ধূসর ছায়াকে এগিয়ে আসতে দেখলেন তিনি। দ্রুত গতিতে এগিয়ে এসে কুকুরটার দশ ফুট দূরে থেমে দাঁড়াল ওটা। চিতাটাই কি ?

অন্ধকারকে শুধু গাঢ় হতে দেয়নি তারার আলো, এইই যা। ওই নগণ্য আলোয় ধূসর ছায়াটাকে আর একটা কুকুরের মতই মনে হল এনডারসনের। ছায়ামত জানোয়ারটার দিকে তাকিয়ে ভয়ানক জোরে চেঁচিয়ে উঠল কেয়ারটেকারের কুকুরটা। নিশ্চয়ই ওটা চিতা—ভাবলেন এনডারসন। রাইফেলের নলের মুখ ধূসর ছায়াটার দিকে ঘুরিয়ে নলে বাঁধা টর্চের সুইচ টেপার জন্যে তৈরি হলেন তিনি। এমন সময় বিকট ভঙ্গিতে হেসে উঠল জানোয়ারটা।

হা! হা! হা! হা! হা! কুকুরটার উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ প্রাণখোলা হাসি হেসে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন জিজ্ঞেস করল জানোয়ারটা, 'চি-ই-ই', 'সি-ই-য়ে', সি-ই-য়ে', বোধ হয় বলল, 'এই যে বাবাজী, মানুষের প্রাণের দোসর,

তা এই গহীন জঙ্গলে রাতের বেলা একাকী করছটা কি তুমি ? তোমার দোস্ত মানুষই বুঝি তোমাকে বেঁধে রেখে গেছে এখানে ?'

হেসে ফেললেন এনডারসনও। জানোয়ারটা একটা হায়েনা। গায়ে লম্বা কালো ডোরাওয়ালা এই হায়েনাগুলোকে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় দক্ষিণ ভারতীয় জঙ্গলে।

হায়েনাটার প্রশ্ন শুনে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল কুকুরটা, বোধহয় ভাবল কি জবাব দেয়া যায়। তারপর আপন মনেই গোঁ গোঁ করে বলল, 'হুঁহু, তাইতো, কি করছি আমি এখানে ? আর শালার মানুষকে এত ভালবাসি আমি, তাদেরই একজন কিনা আমাকে বেঁধে রেখে গেছে এই হতচ্ছাড়া জায়গায়। কিন্তু কেন ?' নিজের মন থেকে উত্তর না পেয়ে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল তার হায়েনাটার ওপর। ভয়ানক ভাবে ঘেউ ঘেউ করে চেঁচিয়ে কুকুরের ভাষায় বলল সে, 'আমি কি করছি, না করছি তাতে তোর মাথা ব্যথা কেন রে হারামজাদা ? ভাগ এখান থেকে !'

কিন্তু ভাগল না হায়েনাটা। কুটিল হাসি হেসে বলল সে, 'গুদ্দা! গুদ্দার! গারাআর! গুর-র-আ (তা তো ভাগবই। সত্যি কথা বলেছি কিনা তাই লেগেছে খুব!)' তারপর চলে যাবার ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে, 'চি-ই-আর, সি-আর (ঠিক আছে থাক তুমি এখানে, আমার কি ?)' বলে চলে গেল হায়েনাটা।

হায়েনাটা চলে যাবার পরেও চেঁচিয়ে ওটাকে গালমন্দ

দিতে থাকল কুকুরটা। গালাগাল শুনেই কিনা কে জানে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘুরে পেছন দিকে রাস্তার অন্য মাথায় এসে আবার উদয় হল হায়েনাটা। কুকুরটাকে কয়েক মুহূর্ত নীরবে অবলোকন করেই বিচিত্র শব্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'হা! হা! হা! গুদ্দার, গার-আর, সি-য়ে!'

অট্টহাসির জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছে আফ্রিকান হায়েনা। পক্ষান্তরে অত্যন্ত নীরব জানোয়ার ভারতীয় হায়েনারা। চামড়ার ওপরের কারুকাজও দুই এলাকার হায়েনার দুই রকম। আফ্রিকান হায়েনার চামড়ায় থাকে চিতার মত কালো কালো ফোঁটা, আর ভারতীয় হায়েনার বাঘের মত কালো ডোরা। স্বভাবও এদের দুই রকম। দল বেঁধে শিকারে বেরোয় আফ্রিকান হায়েনা, আর একাকী কিংবা বড়জোর এক জোড়া করে বেরোয় ভারতীয়গুলো। কিন্তু একটা ব্যাপারে দু'জায়গার হায়েনারই মিল আছে, অত্যন্ত ভীরু এই প্রাণীগুলো। অথচ এদের চোয়ালের প্রচণ্ড শক্তির তুলনা হয় না। এক কামড়ে হাড় শুদ্ধ মানুষের একটা বাহু কেটে নেয়াটা কিছুই না হায়েনার পক্ষে।

অধিকাংশই কাপুরুষ হলেও মাঝে মাঝে দু'একটা সাহসী হায়েনাও চোখে পড়ে, তবে তা ক্বচিত, কদাচিত। কেনেথ এনডারসনের মুখ থেকেই এর একটা উদাহরণ শুনুন, 'একবার একটা চিতার মড়ির ওপর বসে খুনী জানোয়ারটার আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম আমি। একটু পরই এলো চিতাটা এবং এসেই খেতে শুরু করল। ইচ্ছে করলেই

গুলি করতে পারতাম, কিন্তু তা করার আগে চিতাটা বাঘ না বাঘিনী সে ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হতে চাইছিলাম আমি। কারণ, আমি শুনেছিলাম একজোড়া চিতা বাস করে এই এলাকায়, বাঘিনীটার ছয় মাসের বাচ্চাও আছে দুটো। বাচ্চা দুটোকে মা-হারা করতে চাইছিলাম না আমি কিছুতেই।

'চিতাটাকে গুলি করতে দ্বিধা করছি, এমন সময় নাটকীয় ভাবে সেখানে এসে হাজির হল একটা হায়েনা। যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে ওটা। বিশ্রী শব্দে চেঁচিয়ে উঠে চিতাটাকে তাড়া করে না যাওয়া পর্যন্ত দেখতেই পাইনি আমি জানোয়ারটাকে। বিদ্যুতের মত হায়েনাটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল চিতাটা, রাগে জ্বলছে চোখ দুটো। হায়েনাটাকে দেখতে পেয়ে রক্ত পানি করা শব্দে হুংকার দিয়ে উঠল ওটা। চিতাটার পাঁচ ফুট দূরে তার ভয়ংকর থাবার নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় বিচিত্র আওয়াজ করে চলল হায়েনাটা। আমার মনে হল নরকের সব ক'টা শয়তান একত্রিত হয়ে সমানে চেঁচিয়ে চলেছে।

'হায়েনার অসহ্য চেঁচামেচির সাথে চিতার চাপা গোঙানী যোগ হয়ে শব্দের ভয়াবহতা বাড়িয়ে তুলল বহুগুণ। মাঝে মধ্যেই সামনে লাফিয়ে এসে হায়েনার উদ্দেশ্যে থাবা চালাচ্ছে চিতাটা। কিন্তু বিদ্যুতের মত পিছিয়ে এসে চিতার থাবা লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিয়েই আবার পাশ থেকে আক্রমণ করছে ওটাকে হায়েনাটা। কিন্তু এতকিছুর মাঝেও মুহূর্তের জন্যে তার বিশ্রী চিৎকার থামাচ্ছে না সে।

'বেশ কয়েকবার থাবা চালিয়ে আর ধমক মেরেও হায়েনাটার কেশাগ্র স্পর্শ করতে না পেরে প্রচণ্ড রেগে গেল চিতাটা। কাজেই অন্য পথ অবলম্বন করল সে, আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠে ভয় দেখাবার চেষ্টা করল তার শত্রুকে। কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় পেল না তার শত্রু, বরং গর্জনের প্রতিবাদে বিশ্রী চিৎকারের পর্দা চড়িয়ে দিল আরও এক ধাপ।

'কোন রকমেই হায়েনাটার সাথে না পেরে হার মেনে গেল চিতাটা। অমন অদ্ভুত শত্রুর মুখোমুখি হয়নি সে এর আগে কখনও। বুঝতে পারছে, এই বিরক্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে মড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। আস্তে করে মড়ির কাছ থেকে সরে এসে শেষবারের মত হায়েনাটার উদ্দেশ্যে দাঁত খিঁচিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল সে। চিতাটা চলে যাবার পরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল হায়েনাটা, তারপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মড়ির ওপর।'

পাথরের চূড়ায় শুয়ে শুয়ে এই হায়েনাটার উদ্দেশ্যটা কি, ভাবছেন এনডারসন। অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে কুকুরটার বিরুদ্ধে লাগবার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারছে না ওটা, নইলে কুকুরের মাংসে ওই জানোয়ারগুলোর অরুচি আছে বলে শোনেননি তিনি কখনও। আসলে ভয় দেখিয়ে কুকুরটাকে দূরে সরিয়ে নিতে চাইছে হায়েনাটা; এমন কোন জায়গায়, যেখানে নিরাপদে খুন করতে পারে

সে ওটাকে। কিন্তু বাঁধা থাকায় এখান থেকে কোথাও যেতে পারছে না কুকুরটা, আর এটাই দুর্বোধ্য ঠেকছে হায়েনাটার কাছে, সে ভাবছে তাকে ভয় পাচ্ছে না বলেই জায়গা ছেড়ে নড়ছে না কুকুরটা।

কিন্তু নিরস্ত না হয়ে কুকুরটাকে একটানা ভয় দেখিয়েই চলল হায়েনাটা। প্রায় একঘণ্টা পর হায়েনাটার ওপর রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠলেন এনডারসন। বুঝতে পারছেন তিনি, এই নাটক চলতে থাকলে যে কোন চিতা—সে সাধারণই হোক কিংবা মানুষখেকোই হোক, এ এলাকার ত্রিসীমানা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য। কাজেই হায়েনাটাকে তাড়ানো দরকার। খুঁজতে খুঁজতে হাতের কাছেই একটা পাথর পেয়ে গিয়ে সেটা ছুঁড়ে মারলেন তিনি হায়েনাটার দিকে। মৃদু খ্যাপ্ শব্দ করে হায়েনাটার একটু সামনে গিয়ে পাথরটা পড়তেই ছিটকে পেছনে সরে গেল জানোয়ারটা, এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ভাবল কিছু, তারপর গিয়ে ঢুকল পেছনের ঝোপে। ওই বিরক্তিকর প্রাণীটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এনডারসন।

ঠিক পনের মিনিট পর হায়েনাটা যে ঝোপে গিয়ে ঢুকেছিল তার বিশ গজ দূরের একটা ঝোপের ভেতর শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কোন অসাবধানী জানোয়ারের হাঁটার শব্দ শুনে সেদিকে চাইলেন এনডারসন। আরও দুই সেকেণ্ড পর ঝোপটা থেকে বেরিয়ে এল একটা জানোয়ার, এসেই বিকট শব্দে চেঁচাতে শুরু করল। আবার এসেছে হায়েনাটা।

সঙ্গে সঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠল কুকুরটাও। আবার একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে হায়েনাটার দিকে ছুঁড়ে মারলেন এনডারসন। চলে গেল হায়েনাটা, কিন্তু ফিরে এল মিনিট দশেক পরেই। আবার পাথর ছুঁড়ে মারলেন এনডারসন, চলে গিয়ে আবার ফিরে এল হায়েনাটা। পঞ্চমবার তার দিকে পাথর নিক্ষিপ্ত হতেই জায়গাটা সুবিধের না ভেবে বিরক্ত হয়ে শেষ বারের মত একবার 'আহ্-আহ্-আহ্! চি-য়ে, সি-য়ে,' ডাক ছেড়ে চলে গেল সেটা। ঘড়ি দেখলেন এনডারসন, দশটা বেজে গেছে।

বারটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে মানুষের কথা বলার শব্দ কানে এল এনডারসনের। একটু পরই দূরে দুটো লণ্ঠনের মিটমিটে আলো চোখে পড়ল তাঁর। এ-দিকেই এগিয়ে আসছে কয়েকজন লোক। মানুষ এবং আলো দেখতে পেয়েই গোঙানী থামিয়ে দিল কুকুরটা।

আরও কাছে আসতেই গুণে দেখলেন এনডারসন, মোট এগারজন লোকের একটা দল, তাদের দু'জনের হাতে লণ্ঠন এবং একজন ছাড়া অন্য সকলের হাতেই ছোট-বড় বাঁশের লাঠি। সেই একজনের হাতে একটা গাদা বন্দুক। এন-ডারসনকে খুঁজতেই এসেছে ওরা, চলতে চলতেই মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ডাকছে তাঁকে। তাদের ডাকের সাড়া দিয়ে পাথরের চূড়া থেকে নেমে এলেন এনডারসন।

লোকগুলো জানাল এনডারসনকে, ঘণ্টাখানেক আগে মানুষখেকোর হাতে খুন হওয়া কুকুরের মালিকের ছাউনির

কাছেই একটা ঘরের বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকে পাঁচজন ঘুমন্ত নর-নারীর মধ্যে থেকে পঁচিশ বৎসর বয়স্কা একটা মেয়েকে আক্রমণ করে চিতাটা। আক্রান্ত হয়ে জোরে চেঁচিয়ে ওঠে মেয়েটা। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে মেয়েটার মা, বাবা আর দুই ভাইয়ের ওপর দিয়েই তাকে ছেঁচড়ে নিয়ে যেতে শুরু করে মানুষখেকোটা।

যেখান দিয়ে ঢুকেছিল, বেড়ার সেই ভাঙা জায়গা দিয়েই তার শিকারকে বের করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে চিতাটা। তখনও জ্ঞান হারায়নি মেয়েটা, বুঝতে পারছে কি ঘটছে। প্রাণ বাঁচাবার প্রচণ্ড তাগিদে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করতে থাকে সে। এতে কিছুতেই তাকে বের করে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় না চিতাটা। বিরক্ত হয়ে মেয়েটাকে মাটিতে ফেলে ভয়ানক জোরে তার কাঁধ কামড়ে ধরে সে। ততক্ষণে দিয়াশলাই খুঁজে পেয়ে বাতি ধরিয়ে ফেলেছে মেয়েটার এক ভাই। আলো জ্বলতেই সাহস ফিরে পায় মেয়েটার বাপ, আর কিছু না পেয়ে একটু দূরে মাটিতে রাখা পানি ভর্তি পিতলের বদনাটা তুলেই মানুষখেকোর দিকে ছুঁড়ে মারে সে। বিচিত্র থ্যাপ্ শব্দ করে গিয়ে চিতার পিঠে লাগে বদনাটা। পানি-ভর্তি ভারি পিতলের বদনার আঘাত চিতাটার কাছে নতুন, এতে একটু ভড়কে যায় সে। এমনিতেই চিতাই হোক আর বাঘই হোক মানুষখেকো হলেই এরা অস্বাভাবিক ভীতু হয়ে পড়ে, একটুতেই চমকে ওঠে, ভয় পেয়ে যায়। এই চিতাটাও তার ব্যতিক্রম নয়, বদনার আঘাত খেয়েই ছুটে বেড়ার ভাঙা

জায়গা দিয়ে বেরিয়ে চলে যায় সে।

বাবা-মা-ভাই সহ আহত মেয়েটার চিৎকারে কয়েক মিনিটের মধ্যেই জেগে ওঠে সমস্ত গাঁয়ের লোক। হাতের কাছে অস্ত্রশস্ত্র যা পাওয়া গেল তাই নিয়ে বাতি জ্বালিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল তারা। আহত মেয়েটাকে দেখে আর সব শুনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রথমে এনডারসনের কথা মনে পড়ল গাঁয়ের লোকের। তখন এগার জনের এই দলটা তাঁকে খুঁজতে বাংলোর দিকে চলল। সেখানে কেয়ার-টেকারের মুখে এনডারসনের নৈশ অভিযানের কথা শুনে খুঁজতে খুঁজতেই এই পাথরটার কাছে এসে পড়েছে তারা।

একজন লোককে কুকুরটার বাঁধন খুলে দিতে বলেই বাংলোর দিকে ছুটলেন এনডারসন। তাঁর স্টুডিবেকার গাড়িটার পেছনের সীটের ওপর ফেলে রাখা ফার্স্ট-এইড-কিটটা নিয়েই আবার ছুটলেন আহত মেয়েটার বাড়ির দিকে। সেখানে পৌঁছে দেখলেন এক করুণ দৃশ্য অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘরের মেঝে, আর তার মাঝে চিত হয়ে পড়ে আছে হতভাগ্য আহত মেয়েটা।

কামড়ে মেয়েটার ডান কাঁধের বেশ খানিকটা মাংস তুলে ফেলেছে চিতাটা। পেটের কাছটায়ও কামড়ের গভীর ক্ষত-চিহ্ন রয়েছে কয়েকটা। ওখানটায় কামড়ে ধরেই মেয়েটাকে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে যাচ্ছিল চিতাটা। মেয়েটার ডান স্তন আর তার নিচের মাংস ধারাল নখ দিয়ে চিরে ফালা

ফালা করে দিয়েছে হারামি জানোয়ারটা। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে শাড়ী-ব্লাউজ।

দেখেই বুঝতে পারলেন এনডারসন, তাঁর সংগে আনা সাধারণ ফার্স্ট-এইড-কিটের ওষুধপত্র ব্যবহার করে ওই মারাত্মক ক্ষতগুলোর কিছুই করা যাবে না। তবু পটাশিয়াম পারমাংগানেট দিয়ে ক্ষতগুলোকে ভাল মত ধুয়ে একটা পুরোনো পরিষ্কার শাড়ী ছিঁড়ে মেয়েটার কাঁধ, বুক আর পেটে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন তিনি। এরপর দড়ির খাটিয়ায় করে বয়ে এনে আহত মেয়েটাকে এনডারসনের গাড়িতে তুলে দিল তার বাবা, দুই ভাই আর গাঁয়ের তিনজন স্বেচ্ছা-সেবী লোক। গাড়ির পেছনের সীটে মেয়েটাকে যতদূর সম্ভব আরাম করে শুইয়ে দিয়ে তার বাপ-ভাই সহ এখান থেকে সবচেয়ে কাছের কানকানহালি হাসপাতালের দিকে রওনা দিলেন এনডারসন।

ভোর সাড়ে তিনটের দিকে কানকানহালি হাসপাতালে পৌঁছে ঘুম থেকে ডাক্তারকে ডেকে তুলে তার হাতে আহত মেয়েটাকে তুলে দিলেন এনডারসন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছে মেয়েটা, অবস্থা খুবই আশংকা-জনক।

সাড়ে চারটার দিকে, কানকানহালি ট্র্যাভেলার্স বাংলোতে গিয়ে রক্তে ভেজা জামাকাপড় খুলে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে নিলেন এনডারসন। সাথে শুকনো কাপড় নেই, তাড়া-হুড়োয় সংগম ডাক-বাংলোতেই ফেলে রেখে এসেছেন সুট-

কেসটা। বাধ্য হয়ে বাংলোর দারোয়ানের কাছ থেকে একটা চাদর আর একটা ধুতি চেয়ে নিয়ে পরে নিলেন তিনি।

কাকভোরে পোস্ট অফিসের দরজায় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে পোস্ট মাস্টারের ঘুম ভাঙালেন এনডারসন। গজ গজ করতে করতে দরজা খুলে দিল পোস্ট মাস্টার। অসময়ে ঘুম ভাঙানোর জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ব্যাংগালোরে তাঁর অফিসে আরও চার দিনের 'লীভ এক্সটেনশন'এর জন্যে একটা জরুরী টেলিগ্রাম করে দিতে বললেন এনডারসন পোস্ট মাস্টারকে। টেলিগ্রাম করা হয়ে গেলে ইচ্ছে করেই যা ফিস তার চেয়ে বেশি টাকা মাস্টারের হাতে গুঁজে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি।

বাংলোয় ফিরে দেখলেন এনডারসন, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে আহত মেয়েটার ছোট ভাইটা, দু'গাল বেয়ে নেমেছে তাঁর অশ্রুর ধারা। কাঁদতে কাঁদতেই জানাল ছেলেটা একটু আগে মারা গেছে তার বোন।

এর খানিক পরেই সেখানে এসে হাজির হল মৃত মেয়েটার বাবা। ছেলের মত সেও কাঁদতে কাঁদতেই অনুরোধ করল এনডারসনকে. দয়া করে তিনি যেন তাঁর গাড়িতে করে লাশটাকে সংগমে পৌঁছে দেন। সেখানে কাবেরীর কূলে চিতায় তোলা হবে মেয়েটার লাশ, তারপর ভস্মীভূত ছাই-গুলো ভাসিয়ে দেয়া হবে নদীর পানিতে। মায়ের কোলে ঠাঁই না পেলে নাকি কোনদিনই শান্তি পাবে না অপঘাতে মরা মেয়েটার আত্মা। এ করুণ আবেদন এড়ানো যায় না,

অতএব লাশটাকে গাড়িতে বয়ে নিয়ে যেতে রাজী হলেন এনডারসন, তাছাড়া এমনিতেও সংগমেই ফিরে যাচ্ছেন তিনি। প্রতিজ্ঞা করেছেন, চিতাটার শেষ না দেখে কিছুতেই ফিরবেন না সেখান থেকে।

এনডারসন চলে যাচ্ছেন শুনে তার ধুতি-চাদর ফেরত চাইল বাংলোর দারোয়ান। অগত্যা সেগুলো খুলে দিয়ে আবার রক্তমাখা জামাকাপড়গুলো পরেই মৃত মেয়েটার বাপ-ভাই সহ এসে গাড়িতে উঠলেন এনডারসন। প্রথমেই হাসপাতালে গিয়ে পেছনের সীটে তুলে নিলেন মেয়েটার লাশ, কাছাকাছি পুলিশ স্টেশনে থেমে ডেথ রিপোর্ট লেখালেন পুলিশের খাতায়, তারপর ফিরে চললেন সংগমের দিকে।

কাবেরীর তীরে শ্মশান ঘাটে লাশটাকে নামিয়ে দিয়ে বাংলোয় ফিরে চললেন এনডারসন। পথে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে একটা পুকুরে নেমে জামাকাপড়ের রক্ত ধুয়ে গোসল করে নিলেন। বাংলোয় ফিরে ঠাণ্ডা খাবার এবং দুই মগ চা দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে বারান্দায় একটা ইজি চেয়ার পেতে তাতে আধশোয়া হয়ে ধূমপান করতে করতে সামনে দূরের অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা দেখতে লাগলেন। মনের মধ্যে চলেছে চিন্তা, কি করে মারা যায় চিতাটাকে ?

পুরো চারটে দিন আর পাঁচটা রাত আছে এনডারসনের হাতে। যা কিছু করার করতে হবে এই সময়ের মধ্যেই। কিন্তু কি করবেন তিনি ? পশুর টোপের দিকে ফিরেও তাকায় না এই মানুষখেকো চিতাটা, বিস্তৃত এলাকা জুড়ে

এটার রাজত্ব। আর সবচেয়ে বড় কথা দুর্ধর্ষতার চরমে পৌঁছে গেছে এটা। রাতের বেলা বেড়া ভেঙে ঘরে ঢুকে মানুষ ধরে নিয়ে যাবার সাহস এবং বুদ্ধিও অর্জন করে ফেলেছে। কি করে যে ঠেকাবেন চিতাটাকে এই সমস্যা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি এক সময়ে।

বেলা তিনটার দিকে ঘুম ভেঙে গেল এনডারসনের। ঘুমের মধ্যেই সমস্যাটার সমাধান করে ফেলেছে তাঁর অবচেতন মন। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তাই সমাধানটা মনে মনে পর্যালোচনা করে দেখতে লাগলেন তিনি। গ্রামটা ছোট্ট, বড়জোর ডজনখানেক ঘর আছে এখানে। গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া একমাত্র রাস্তাটার দু'ধারে অবস্থিত সব ক'টা ঘর। রাস্তার দক্ষিণ মাথায় নদীর কাছাকাছি একটা গোশালা আছে, (গোশালা বলতে একশ বর্গগজ জায়গা বাঁশ আর কাঁটালতা দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে) সম্মিলিত ভাবে তৈরি করেছে এটা গাঁয়ের লোকে। এই গোশালার পুব পাশে প্রায় গায়ে গায়ে লেগে আছে চিতার হাতে নিহত কুকুরের মালিকের ঘরটা। মালিক মারা যাওয়ার পরও ওই ঘরেই থাকে কুকুর চারটে। গোশালার ভেতর গরুর পালের মধ্যে গিয়ে বসলে বেশ নিরাপদে থাকা যায়। কারণ, চিতাটা এলে অশান্ত হয়ে উঠে হুঁশিয়ারি জানাতে শুরু করবে গরুর পাল। তাছাড়া, পাশের ঘরের কুকুরগুলোও চেঁচিয়ে উঠে বিপদ সংকেত জানাবে।

গোশালার ভেতরে বসে চিতার অপেক্ষা করার পরিকল্পনাটা

বেশ পছন্দ হল এনডারসনের। উঠে পড়ে হাত মুখ ধুয়ে রাতের জন্যে তৈরি হতে শুরু করলেন তিনি। খাকী রঙের একটা 'বালাক্লাভা' টুপি পরে নিলেন—মাথাটাকে শিশির থেকে রক্ষা করবে এটা। গায়ে চড়ালেন গরম জামাকাপড়। সাথে নিলেন বিস্কুট, ফ্লাস্কভর্তি গরম চা, পাইপ, তামাক আর অবশ্যই সবচেয়ে দরকারি জিনিস রাইফেলটা।

ছ'টা বাজেনি তখনও, কিন্তু গাঁয়ের সব ক'টা ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এরই মধ্যে। ভেতরে ঢুকে গোশালার ঠিক মাঝখানে জায়গা করে নিলেন এনডারসন। তাঁর কাছ থেকে চারদিকেই বেড়ার দূরত্ব পঞ্চাশ গজের মত। আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শ'খানেক ছোট-বড় নানা আকারের গরু।

প্রথম প্রথম এনডারসনের উপস্থিতি মেনে নিতে চাইল না গরুর দল। গলায় পিঠে হাত বুলিয়ে ওদের বন্ধু হতে চাইলেন তিনি। কিন্তু সহজে তা হতে চাইল না তারা। মাটিতে নামিয়ে রাখা তাঁর ফ্লাস্কটা লাথি মেরে প্রায় ভেঙেই দিয়েছিল একটা গরু। একজোট হয়ে তেড়ে এল কয়েকটা ষাঁড়, এনডারসনের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁকে গুঁতোবার ভঙ্গি করল। চকচকে, চোখা শিংগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রমাদ গুণলেন এনডারসন। তাড়াহুড়ো না করে এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থেকে জিভ দিয়ে নানারকম শব্দ করে থামাবার চেষ্টা করলেন ষাঁড়গুলোকে। এনডারসনের কাছ থেকে কোন রকম বিপদের সম্ভাবনা নেই দেখে

আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেল ও-গুলো। একঘণ্টা যেতে না যেতেই গরুর দল বন্ধু হয়ে গেল তাঁর।

ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে প্রহরগুলো। চারপাশে বিরাজ করছে অখণ্ড নীরবতা। গরুগুলোও ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মধ্যে ঘুমের ঘোরেই গোঁ গোঁ করে উঠে নীরবতা ভাঙছে দু'একটা গরু। এনডারসনের গা ঘেঁষে শুয়ে পড়েছে একটা গাই, বোধহয় উষ্ণ স্পর্শের লোভেই।

হঠাৎ ঘাড়ের কাছে কিসে কুট করে কামড় মারতেই উহ্ করে উঠলেন এনডারসন। ঘাড়ের কাছে চুলকালেন বার কয়েক। মিনিট খানেক পরই আবার বাঁ হাতের উল্টো পিঠে একই ধরনের ব্যথা অনুভব করলেন তিনি। এবারে বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা—ডাঁশ (এক ধরনের রক্তপায়ী পোকা)। সর্বনাশ! এ পোকা থাকলে তো চুপ করে বসা যাবে না। ক্রমেই বাড়ছে তাদের কামড়। গায়ের যেখানেই খোলা জায়গা পাচ্ছে সেখানেই এসে কামড় বসাচ্ছে অসংখ্য পোকা। বার বার গায়ের এখানে ওখানে চাপড় মারছেন আর চুলকাচ্ছেন এনডারসন। কিন্তু তাতে লাভ হচ্ছে না কিছু, বরং চুলকানি আরও বেড়ে যাচ্ছে। পরনের কাপড় দিয়েই টেনেটুনে শরীরের খোলা জায়গাগুলো ঢাকার চেষ্টা করলেন তিনি।

ডাঁশগুলোর জ্বালায় সময় যেন আরও দীর্ঘ মনে হচ্ছে এনডারসনের কাছে। রাত একটা বাজতেই গাঁয়ের উত্তরের ছোট্ট পাহাড়টার ওপর থেকে ঘণ্টার মত শব্দ করে ডেকে

উঠল শম্বর হরিণী। একটানা ডেকেই চলল হরিণীটা। একটু পরেই হরিণীটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে পাহাড়ের পাদ দেশের নালাটার কাছ থেকে ডাকতে শুরু করল একটা কাঁকর।

শম্বরের ডাক থেমে গেছে, কিন্তু ডাকতে ডাকতে ক্রমশ পাহাড়ের ওপর উঠে যাচ্ছে কাঁকরটা। অর্থাৎ হরিণ দুটোর পক্ষে বিপজ্জনক প্রাণীটা পাহাড়ের নিচ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

আরও বিশ মিনিট পর চেঁচিয়ে বিপদ সংকেত জানাতে শুরু করল চিতল হরিণের দল। পাহাড়ের গোড়া থেকে শুরু করে নদীর ধার পর্যন্ত চলে যাওয়া জঙ্গলের ভেতর থেকে ডাকছে ওগুলো। নিশ্চয়ই নৈশ অভিযানে বেরিয়েছে কোন বাঘ বা চিতা। আর কয়েক মিনিট পরই বোঝা যাবে জানোয়ারটা কি।

নিকষ কালো অন্ধকারে ঢেকে গেছে এখানে প্রকৃতি। ঠিক এই সময় হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল গরুগুলো। আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠছে সব ক'টাই। এনডারসনের গা ঘেঁষে শোয়া গরুটা উঠে দাঁড়াতেই তিনিও উঠে পড়লেন। নাক দিয়ে চাপা শব্দ করতে শুরু করল কয়েকটা ষাঁড়। প্রত্যেকটা গরুরই লক্ষ্য গাঁয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা পথটার দিকে।

ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে সব ক'টা গরু, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে খোঁয়াড়ের নদীর দিকের বেড়ার কাছে। যেন পথটার দিক থেকেই বিপদ আশা করছে ওরা। প্রচণ্ড জোরে চেঁচাতে শুরু করেছে পাশের ঘরের চারটে কুকুর। পথের

দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিপদজ্জনক জানোয়ারটার অপেক্ষা করতে থাকলেন এনডারসন।

গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না এনডারসনের। যে কোন রকম সন্দেহজনক শব্দ শোনার জন্যে কান খাড়া করে রেখেছেন তিনি, কিন্তু কুকুরের প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ আর গরুর চাপা 'মু-ও-ও! মু-ও-ও!' ছাপিয়ে কোন শব্দ তাঁর কানে পৌঁছার আশা খুবই কম। তবু শুনলেন তিনি কাঠের গায়ে নখের আঁচড়ের মৃদু শব্দ। আস্তে আস্তে বাড়ছে তা, বোধহয় অধৈর্য হয়ে উঠছে শব্দ সৃষ্টিকারী। আওয়াজটা কোন্‌দিক থেকে আসছে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলেন এনডারসন। হঠাৎ বুঝে ফেললেন তিনি, রাস্তার দিক থেকে হচ্ছে শব্দটা এবং হচ্ছে চিতাটার কোন ঘরের দরজা আঁচড়াবার ফলেই।

গরুগুলোর পাশ কাটিয়ে দ্রুত গোশালার বেড়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে রাইফেলের নলের মুখ শব্দের উৎসের দিকে ফিরিয়ে টর্চের সুইচ টিপে দিলেন এনডারসন, কিন্তু কিছুই নজরে পড়ল না তাঁর। ঠিক সেই মুহূর্তে ওদিকেরই একটা ঘরের ভেতর থেকে শোনা গেল মানুষের ভয়ার্ত গলার চিৎকার।

বেড়া ভেঙে ঘরে ঢুকে নিশ্চয়ই কোন লোককে আক্রমণ করেছে মানুষখেকোটা, ভাবলেন এনডারসন। বিন্দুমাত্র দেরি না করে ছুটলেন তিনি বাঁশ এবং কাঁটালতা দিয়ে তৈরি গোশালার একমাত্র দরজাটার দিকে। বিকেলে গোশালায়

ঢুকেই দরজাটায় একটা ভারি ইংরেজী ওয়াই-এর আকৃতির গাছের ডাল দিয়ে ঠেকা দিয়ে রেখেছিলেন, আর গাছের ডালের ঠেকা মজবুত করার জন্যে তার গোড়ায় ফেলে রেখেছিলেন একটা বড় পাথর (জিনিসগুলো গোশালার ভেতরই মজুত ছিল। এগুলোর সাহায্যেই দরজাটা বন্ধ করে গাঁয়ের লোকে)। এই তাড়াহুড়োর সময় ডাল আর পাথর সরিয়ে দরজা খুলতে বেশ বেগ পেতে হল এনডারসনকে।

বাইরে বেরিয়ে এসে গোশালার দরজার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন এনডারসন, এতে পেছন থেকে আক্রান্ত হবার ভয় নেই। টর্চের আলো ফেলে ভালমত আশপাশটা পরীক্ষা করে দেখলেন, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না তাঁর। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে চিতাটা। এই সময় গাঁয়ের দিক থেকে আবার শোনা গেল মানুষের চিৎকার।

হঠাৎ মনে হল এনডারসনের, তাইতো, ঘরের ভেতরেই থেকে গিয়ে লোকগুলোকে মারছে নাতো চিতাটা? অসম্ভব কি? সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন তিনি। অত্যন্ত সতর্কভাবে পার হয়ে এলেন গোশালা আর রাস্তার পাশের ঘরটার মাঝখানের বিশ গজ দূরত্ব।

ধাক্কা দিয়েই বুঝতে পারলেন এনডারসন, ভেতর থেকে শক্ত করে বন্ধ করা আছে দরজা। ভেতরের লোকজনকে ডাকলেন তিনি। নিজেদের মধ্যে হট্টগোলের জন্যে প্রথমে তাঁর ডাক শুনতে পেল না কেউ। আবার ডাকলেন এনডারসন, আবার। বার কয়েক চেঁচিয়ে ডাকার পর তাঁর ডাক

শুনতে পেল লোকগুলো। একজন জানতে চাইল, 'এত রাতে কে ডাকাডাকি করছ, মানুষ না ভূত?'

'আরে না না, ভূত না, আমি মানুষই। শিকারী।' উত্তর দিলেন এনডারসন।

কিন্তু বিশ্বাস করল না লোকগুলো। বলল, 'মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না। এইমাত্র দরজা আঁচড়াচ্ছিল চিতাটা। এরই মাঝে সে চলে গেল আর তার জায়গা দখল করল একজন মানুষ!' নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা করল তারা। একজন তো আর একজনকে বলেই ফেলল, 'খবরদার, গোবিন্দ, দরজা খুলবি না। চিতাটাই মানুষের রূপ ধরে ডাকাডাকি করছে। দরজা খুলেছিস কি ঘাড় মটকে দেবে।' অন্যরাও সমর্থন করল কথাটা। তারপর আগের লোকটাই চেঁচিয়ে এনডারসনকে বলল, 'তুমি যেই হওনা কেন, বাপু, ভোরের আগে দরজা খুলছি না।'

বিপদে পড়ে গেলেন এনডারসন। লোকগুলোর কথা শুনে আরও নিশ্চিত হলেন তিনি, একটু আগে দরজা আঁচড়ানোর শব্দ করছিল চিতাটাই। আশপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে হয়তো ওটা। সুযোগ খুঁজছে আক্রমণের। মাঝখানের বিশ গজ খোলা জায়গা পেরিয়ে গোশালায় যাওয়াটা তাঁর পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজ এখন। এখানেই দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসে ভোরের অপেক্ষা করবেন? কিন্তু সেটাও মোটেই নিরাপদ না। কি করবেন ভাবতে ভাবতেই দরজার ওপর টর্চের আলো ফেললেন তিনি।

দরজার গায়ে চিতার নখের স্পষ্ট আঁচড়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

চারপাশে আর একবার টর্চের আলো ফেলে দেখে গোশালায় ফিরে যাওয়াই স্থির করলেন এনডারসন। অতি সাবধানে এক পা এগিয়েই ঘুরে ঘুরে টর্চের আলোয় আশ-পাশটা দেখে নিতে নিতে এগোতে শুরু করলেন তিনি। বিশ গজ পথ যেন ফুরোতেই চাইছে না, বিশ মাইলের মত মনে হচ্ছে। দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর বারটা বাজিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিরাপদেই গোশালায় ফিরতে পারলেন তিনি। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ডাল আর পাথরের সাহায্যে তা ঠেকা দিয়ে রেখে ফিরে এলেন আগের জায়গায়।

তৃষ্ণায় শুকিয়ে উঠেছে এনডারসনের গলা। এসময় একটু চা হলে মন্দ হয় না। ফেলে যাওয়া ফ্লাস্কটা টর্চের আলোয় খুঁজে পেলেন ঠিকই, কিন্তু চা আর খাওয়া হল না। হুড়োহুড়ির সময় পা দিয়ে মাড়িয়ে ওটাকে চ্যাপ্টা করে দিয়েছে গরুর দল। বিস্কুটের প্যাকেটটার অবস্থাও শোচনীয়। তালগোল পাকানো প্যাকেটের ভেতর থেকে আর একটা বিস্কুটও উদ্ধার করা যাবে না। ভাগ্যিস পকেটেই ছিল পাইপটা, না হলে ওটাও যেত। একটা গাইয়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে পাইপ টানতে টানতেই বাকি রাতটা কাটিয়ে দেয়া মনস্থ করলেন তিনি।

পরদিন ভোরে হতাশ মন আর শ্রান্ত শরীর নিয়ে বাংলোয় ফিরে এলেন এনডারসন। ডাঁশের কামড়ে ছোট ছোট ক্ষত হয়ে আছে শরীরের এখানে ওখানে। ভীষণ চুলকাচ্ছে

ক্ষতগুলো। আগামী দশ দিন পর্যন্ত ভোগাবে এগুলো তাঁকে, এটা সুনিশ্চিত।

ঠাণ্ডা পানিতে স্নান সেরে, রুটি-মাখন, বেকন আর চা খাবার পর ঘুমোতে চললেন এনডারসন। বেলা বারটায় ঘুম থেকে উঠে খেয়ে নিয়ে আবার শুলেন। উঠলেন বিকেল তিনটেয়। সারা রাতের ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়ে ঝর ঝরে মনে হচ্ছে শরীর মন। বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে রাতের জন্যে নতুন পরিকল্পনায় মন দিলেন তিনি।

গরুর সাথে আবার গোশালায় বসে রাত কাটানো অসম্ভব। গত রাতের মত এ রাতেও ডাঁশের কামড় খেলে টিক ফিভার না হয়ে যাবে না। তবে গরু আর কুকুর মিলে আগে-ভাগেই চিতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেয়ার ব্যাপারটা লোভনীয়।

ভাবতে ভাবতেই নতুন পরিকল্পনাটা মাথায় এল এনডার-সনের। এতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না, অর্থাৎ, গরু আর কুকুরের সাহায্যও পাওয়া যাবে, ডাঁশের কামড়ও খেতে হবে না। আগেই বলা হয়েছে, কুকুরগুলো যে ঘরে থাকে তার চাল টিনের। এই চালের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে থেকেই গাঁয়ের একমাত্র রাস্তাটার দিকে নজর রাখার পরি-কল্পনা করলেন এনডারসন। ওই পথ ধরে যদি এগিয়ে আসে তাহলে চিতাটাকে স্বচ্ছন্দে গুলি করতে পারবেন তিনি। তাছাড়া তাঁর নিচেই থাকছে কুকুরগুলো, পাশের গোশালায় গরুর পাল। বাকি থাকছে দু'পাশ এবং পেছন

থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা। কারণ চিতাকে বিশ্বাস নেই। সে-সমস্যারও সমাধান করে ফেললেন তিনি। প্রচুর কাঁটা ঝোপ কেটে পেছনে এবং দু'পাশে ছড়িয়ে দিলেই হবে। চিতার মত ভারি একটা জানোয়ার চালে লাফিয়ে উঠলেই তা টের পেয়ে যাবেন তিনি, তার ওপর কাঁটাঝোপের ব্যারি-কেড দিয়ে রাখলে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

উঠে পড়লেন এনডারসন। গত রাতের পোশাকগুলোই পরে নিলেন, কারণ এ রাতটাও খোলা আকাশের নিচেই কাটাতে যাচ্ছেন তিনি। খাবার জন্যে নতুন এক প্যাকেট বিস্কুট সাথে নিলেন। চা-ও নিলেন, তবে ফ্লাস্ক ভেঙে যাওয়ায় বাংলোর দারোয়ানের কাছ থেকে একটা খালি বিয়ারের বোতল চেয়ে নিতে হল। বিয়ারের বোতলে গরম থাকবে না চা, কিন্তু কি আর করা, গলাটা তো অন্তত ভেজানো যাবে তা দিয়ে।

গাঁয়ের লোকদের এনডারসনের ইচ্ছার কথা বলতেই তারা সানন্দে কয়েক বোঝা কাঁটাঝোপ কেটে তা কায়দা করে বিছিয়ে দিল চালের ওপর। কয়েকজন বুদ্ধি করে এনডারসনের শোবার জন্যে নির্দিষ্ট করা জায়গাটুকুতে খড় বিছিয়ে দিল পুরু করে।

ছ'টা নাগাদ চালে উঠে পড়লেন এনডারসন। সাথে সাথেই দুটো ভুল ধরা পড়ল তাঁর চোখে। এক, তিনি যেদিকে মুখ করে আছেন সেদিকে চালটা একটু ঢালু। এতে শোয়ার পর তার মাথা থেকে পা একটু উঁচুতে থাকছে।

বেশিক্ষণ এভাবে শুয়ে থাকা সম্ভব হবে না। দুই, তিনি বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করলেই সশব্দে আর্তনাদ করে উঠে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে নড়বড়ে কাঠামোতে আটকানো পুরোনো টিনের চাল। গুলি করার সময়ে সামান্য নড়াচড়া করতে হবে তাঁকে, এবং তাতেই চিতাটার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে তাঁর অস্তিত্ব। কিন্তু এটুকু ঝুঁকি না নিয়েও উপায় নেই। তাই যা থাকে কপালে ভেবে তাঁর জন্যে নির্ধারিত জায়গায় শুয়ে পড়লেন তিনি।

কিন্তু সে-রাতে এল না চিতাটা। খামোকাই বেকায়দা অবস্থায় শুয়ে একটা অত্যন্ত কষ্টকর রাত কাটালেন এনডারসন। পরদিন ভোরে বাংলোয় ফিরে গোসল সেরে খেয়ে দেয়ে ঘুম দিলেন সারাদিনের জন্যে। বিকেলের দিক ঘুম থেকে উঠেই চিতার টোপের জন্যে বেঁধে রাখা পাঁচটা ষাঁড়ের বাচ্চার কথা মনে পড়ল তাঁর। তাড়াতাড়ি বাংলোর দারোয়ানকে দিয়ে গাঁয়ের কয়েকজন লোক ডাকিয়ে এনে টোপগুলোর তদারক করতে যাবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু লোকগুলো জানাল, সাহেবের মনে না থাকলেও রোজই টোপগুলোর খোঁজ নেয় তারা, বাচ্চাগুলোর খাবার জন্যে নিয়মিত খড় আর পানিও দিয়ে আসে। ধন্যবাদ দিয়ে লোকগুলোকে বিদায় করে দিলেন এনডারসন।

আর একটা দুঃসহ রাত কাটাবার জন্যে তৈরি হয়ে চালে গিয়ে উঠলেন এনডারসন। অতি ধীরে কাটছে সময়। মাঝ রাত পেরিয়ে গেল কিন্তু চিতাটার আসার কোন লক্ষণই

নেই। ক্রমে একটা বাজল, দুটো। ঘুম আসছে এনডারসনের। হঠাৎ, বোধহয় ঘুমের ঘোরেই কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক কানে পৌঁছল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠলেন তিনি।

অতি ধীরে কয়েক ইঞ্চি সামনে এগিয়ে গাঁয়ে যাবার পথটার দিকে তাকালেন এনডারসন। আকাশে হালকা মেঘ থাকায় তারার আলোয় তেমন উজ্জ্বলতা নেই। সে আলোয় মোটেই কাটছে না অন্ধকার। রাস্তাটাকেও ঠাহর করা যাচ্ছে না ভালমত। কাজেই চিতা বা অন্য কোন জানোয়ারের ছায়াও চোখে পড়ল না তাঁর।

হঠাৎই শব্দটা কানে এল এনডারসনের। রেগে গেলে ফণা তুলে যে রকম হিস্ হিস্ করে ওঠে গোখরা সাপ, শব্দটা ঠিক তেমনি। আবার হল শব্দটা। মনে হচ্ছে এনডারসনের চালার নিচে মাটিতেই রয়েছে সাপটা।

অতি সাবধানে গলা বাড়িয়ে নিচে উঁকি দিলেন এনডারসন। প্রথমে কিছুই দেখতে পেলেন না, কিন্তু একটু ভাল করে চাইতেই ওটা চোখে পড়ল তাঁর। চালাটার কয়েক গজ দূরে রাস্তার ধূসর বালির পটভূমিকায় একটা গাঢ় রঙের ছায়া। একবার যেন নড়ল বলে মনে হল ছায়াটা। আবার শোনা গেল হিস্ হিস্ শব্দটা, এবার অপেক্ষাকৃত জোরে। চালার ভেতরে চাপা গলায় গোঁ গোঁ করছে কুকুরগুলো, যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে কোন কারণে। চঞ্চল হয়ে ডাকা ডাকি করছে গরুর দল। আর সন্দেহ রইল না এনডারসনের,

রাস্তার ওপরে বসা ছায়াটাই চিতা।

যেখানে শুয়ে আছেন এনডারসন সেখান থেকে নিচের ওই ছায়াটার দিকে রাইফেল তুলে নিশানা করা যায় না। তা করতে হলে আর একটু সামনে এগোতে হবে তাঁকে, অন্তত টিনের চালের বাইরে নিয়ে আসতে হবে মাথা আর কাঁধ। মনস্থির করে নিয়ে অতি সাবধানে এক মিলিমিটার করে করে এগোতে শুরু করলেন তিনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও টিন আর খড়ের সাথে ঘষা লেগে অতি মৃদু একটু শব্দ হয়ে গেলই, আর চিতার অকল্পনীয় তীক্ষ্ণ শ্রবণ শক্তির জন্যে তা-ই যথেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ চাপা গর্জন করে উঠল রাস্তার ওপর বসা চিতাটা। এক লাফে চালের কাছে পৌঁছে গেল সে। ঝটিতি পিছিয়ে এলেন এনডারসন। না হলে নিচ থেকেই থাবা চালিয়ে তাঁর মুখ চোখ চিরে দিত চিতাটা। হার্টবীট বেড়ে গেছে এনডারসনের। যে কোন মুহূর্তে চালে লাফিয়ে উঠে পড়তে পারে চিতাটা।

অযথা অপেক্ষা করে চিতাটাকে আগে আক্রমণ করার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত আবার সামনে এগিয়ে গেলেন এনডারসন। নিচে উঁকি দিতেই দেখলেন চালে লাফিয়ে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে চিতাটা। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে টর্চের সুইচ টিপলেন তিনি। টর্চের আলোয় জ্বল জ্বল করে উঠল দুটো ভয়ঙ্কর চোখ। ওই চোখ দুটোর ঠিক মাঝখানে নিশানা করে রাইফেলের ট্রিগার টিপে দিলেন এনডারসন। পয়েন্ট-ব্ল্যাংক রেঞ্জে ভারি রাইফেলের গুলি খেয়ে পেছনে ছিটকে পড়ল

চিতাটা। সংগম এলাকার এক ভয়ঙ্কর মানুষখেকো দানবের কবল থেকে আঞ্চলিক লোকজনকে মুক্তি দিতে খরচ হল মাত্র একটি বুলেট।

পরদিন সকালে চিতাটাকে পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন এনডারসন, অত্যন্ত বয়স্কা একটা বাঘিনী ওটা। রোম ওঠা মলিন গায়ের চামড়ার রঙ। ক্ষয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে থাবার নখগুলো। বোঝাই যাচ্ছে স্বাভাবিক শিকার ধরতে একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েছিল, তাই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই শুধু মানুষ খেতে শুরু করেছিল জানোয়ারটা। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি, সাহস আর আধুনিক মারণাস্ত্রের কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতেই হল তাকে।

পানারের মানুষখেকো

নৈনিতালে কিছুটা বিশ্রাম নিয়েই আবার বেরিয়ে পড়লেন করবেট। এবারের লক্ষ্য পানারের মানুষখেকো। পানার এলাকায় সবচেয়ে বেশি মানুষ খুন করেছিল ওই ভয়ঙ্কর চিতাটা, তাই পানারের মানুষখেকো নামেই পরিচিত হয়েছিল ওটা। অঞ্চলটা করবেটের অপরিচিত, তাই আলমোড়ার ডেপুটি কমিশনার এবং তাঁর বন্ধু ষ্টিফের কাছ থেকে চিতাটা আর ওই অঞ্চলটা সম্পর্কে বিশদ ধারণা নেবার উদ্দেশ্যে প্রথমেই আলমোড়া রওনা হলেন করবেট।

যথাসময়েই আলমোড়া এসে পৌঁছুলেন করবেট। দুপুরের খাওয়াটা তাঁর বন্ধু ষ্টিফের অনুরোধে সেখানেই সারতে হল করবেটকে। খাওয়া দাওয়ার পর আলমোড়া জেলার একটা ম্যাপ বের করে চিতাটা কোথায় কোথায় অভিযান চালাচ্ছে তা করবেটকে বুঝিয়ে দিলেন ষ্টিফ। ম্যাপে দেখা গেল দুটো রাস্তা আছে ওই অঞ্চলে পৌঁছানোর, একটি

পিথোরা গড় রোড ধরে পাওয়ান-উলা হয়ে, অন্যটি দাবিধুরা রোড ধরে লামগাড়া হয়ে। পরের রাস্তা ধরে যাওয়াই ঠিক করলেন করবেট। কারণ ওদিকে শেষ মানুষ মেরেছে চিতাটা। ষ্টিফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠবার আগের মুহূর্তে ঠাট্টা করে বলেছিল সে, 'জিম, তোর তো বেশ কিছু জায়গা-সম্পত্তি আছে বলে জানি। তা এক কাজ কর, ওগুলো আমার নামে উইল টুইল করে দিয়ে যা। ওই চিতাটার হাত থেকে জান বাঁচিয়ে আর ফিরতে পারবি কি না কে জানে। যতদুর জানি চিতা নামের ওই চতুষ্পদ শয়তানটার সাথে লাগতে গিয়ে আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি কোন শিকারী।'

কিন্তু ষ্টিফের কথায় ভয় পেলেন না করবেট। সাথে একজন চাকর ও চারজন মালবাহী কুলি নিয়ে দুপুরের খাওয়ার পর পরই আলমোড়া শহর ছাড়লেন তিনি। প্রায় চৌদ্দ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যার একটু পর একটা নির্জন বাড়িতে এসে পৌঁছুলেন তিনি। বাড়ির দেয়ালে আঁকি-বুকির চিহ্ন আর এদিক ওদিক পড়ে থাকা ছেঁড়া টুকরো কাগজ দেখে অনুমান করা যায় ওটা একটা স্কুল।

চারদিক আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে তখন আকাশে উঠে এসেছে পূর্ণ চাঁদ। রাতটা এখানেই কাটাবেন ঠিক করলেন করবেট। মানুষখেকোর এলাকা তখনও বেশ ক'-মাইল দূরে। স্কুল বাড়িটার সামনের বিশাল আঙিনার তিন দিকই দুই ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। জায়গাটা মোটামুটি নিরাপদ।

তাঁবু নেই সঙ্গে। ঘরের দরজায়ও তালা দেয়া, সুতরাং বারান্দায়ই কাটাতে হবে রাতটা। স্কুলের পেছনের জঙ্গলে জ্বালানীর অভাব নেই। কাজেই আগুন জ্বালাতে অসুবিধে হল না। রান্নার জোগাড়ে ব্যস্ত হল করবেটের চাকর। ঘরের তালাবদ্ধ দরজার গায়ে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট টানতে টানতে তাই দেখতে লাগলেন করবেট। রাস্তার ধারের দেয়ালটা করবেটের কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে। দেয়ালটার ওপাশে রাতের খাবারের জন্যে সাথে করে আনা একটি আস্ত ভেড়ার ঠ্যাং এবং মালপত্রগুলো নামিয়ে রেখে আগুনটা ঠিক করার জন্যে ফিরে এল চাকরটা। সেদিকে চোখ পড়তেই দেখলেন করবেট, তার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা চিতা। চুপচাপ বসে থেকে চিতাটা কি করে দেখতে লাগলেন করবেট। একবার ভেড়ার ঠ্যাংটার দিকে, একবার চাকরটার দিকে তাকাচ্ছে চিতাটা। চাকরটা মাংসের কাছ থেকে কয়েক ফুট সরে আসতেই এক লাফে দু'ফুট উঁচু দেয়াল পেরিয়ে চিতাটা এসে পড়ল ভেড়ার ঠ্যাং এর ওপর, তারপর ঠ্যাংটা মুখে তুলে নিয়েই লাফ দিয়ে আবার দেয়াল পেরিয়ে ওপাশের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকে পড়ল সে। একটা খবরের কাগজ দিয়ে পেঁচানো ছিল মাংসের টুকরোটা। চিতাটা ওটা নিয়ে পালাবার সময় কাগজের খস খস শব্দে ফিরে তাকাল চাকরটা। ভেড়ার ঠ্যাংটা কুকুরে নিয়ে পালাচ্ছে ভেবে লাফ দিয়ে উঠে ওটাকে তাড়া করল সে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই টের পেল সে, ওটা কুকুর না,

চিতা। সাথে সাথেই অ্যাবাউট টার্ণ হয়ে পড়ি মড়ি করে ছুটে এল সে করবেটের কাছে। এসে যখন দেখল হাসছেন করবেট, ক্ষেপে গেল সে। বলল, 'আপনার সামনে থেকে ঠ্যাংটা নিয়ে গেল হারামজাদাটা, আর আপনি কিছুই বললেন না। খাবেন কি আজ রাতে? আপনার খাবারই তো নিয়ে গেল চিতাটা।' চাকরটা ক্ষেপে যাওয়ায় এবার শব্দ করেই হেসে উঠলেন করবেট। এতে আরও রেগে গেল চাকরটা। মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, 'রাতে উপোষ থাকলেই ঠ্যালাটা টের পাবেন।' সে রাতে অবশ্য করবেটকে উপোষ করিয়ে রাখেনি সে। একটা আস্ত জ্যান্ত মুরগি তখনও ছিল তার স্টকে।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই দল বল নিয়ে রওনা দিলেন করবেট। শুধু নাশতা সারার জন্যে বেলা দশটায় লামগাড়ায় থামলেন একবার। জোর হেঁটে বিকেল নাগাদ পৌঁছলেন এসে ডোল ডাকবাংলোয়। এখান থেকেই মানুষখেকোর এলাকা শুরু হয়েছে। পরদিন সকালে সঙ্গের লোকজনকে ডাক-বাংলোয় রেখে মানুষখেকোর খোঁজে বেরোলেন করবেট। গ্রামে গ্রামে ঘুরে, পায়ে চলা পথগুলোতে চিতার পায়ের ছাপ খুঁজতে খুঁজতে সাঁঝের বেলা লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন একটা বাড়িতে এসে পৌঁছুলেন তিনি। পাথরের দেয়াল আর স্লেটের ছাদে তৈরি একটি মাত্র ঘর, সংলগ্ন বিঘে কয়েক চাষের জমি আর আগাছার জঙ্গল, এই হল বাড়ি। বাড়িতে ঢোকার পথের মুখে বিশাল

মদ্দা চিতার পায়ের ছাপ চোখে পড়ল করবেটের।

করবেট বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়াতেই ঘরের সরু বারান্দা থেকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল একজন যুবক। বাইশ তেইশ বছর বয়স হবে ওর। যুবকটির কাছেই শুনলেন করবেট, অত্যন্ত বিপদে পড়েছে সে। আগের রাতে ঘরের মেঝেতে শুয়েছিল যুবকটি আর তার বউ। এপ্রিল মাস। প্রচণ্ড গরম পড়ায় ঘরের একটি মাত্র দরজা খুলেই শুয়েছিল ওরা। মাঝ রাতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠে যুবককে জড়িয়ে ধরে তার বউ। আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় প্রথমে দু'-এক মুহূর্ত কিছুই বুঝতে পারেনি যুবকটি। তারপর দেখল গলা কামড়ে ধরে তার বউকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা চিতা। সাথে সাথেই বউয়ের দু'হাত চেপে ধরে ঝটকা মেরে তাকে মানুষখেকোর মুখ থেকে ছিনিয়ে এনে দরজা বন্ধ করে দেয় যুবকটি। বাকি রাতটা বউকে নিয়ে ঘরের কোণে বসে ভয়ে কাঁপতে থাকে সে। কারণ, বাইরে থেকে ঘরের দরজায় সমানে আঁচড়াচ্ছে আর গর্জাচ্ছে চিতাটা। যে-কোন সময় ভেঙে পড়তে পারে দরজা, আর তাহলেও মানুষখেকোর হাত থেকে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের কেউই রেহাই পেত না। সারারাত সেই বন্ধ ঘরে থেকে মেয়েটির গলার ঘা ক্রমেই বিষাক্ত হয়ে পড়ে এবং ভোরের দিকে অজ্ঞান হয়ে যায় সে।

পরের দিনও বউয়ের কাছেই বসে ছিল যুবকটি। কারণ চিতাটা ফিরে এসে তার বউকে নিয়ে যাবার ভয় ছিলই; তাছাড়া সবচেয়ে কাছাকাছি প্রতিবেশীর কাছে যেতে হলেও

প্রায় এক মাইল পথ ঘন আগাছা আর লম্বা ঘাসের জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হতো তাকে। মানুষখেকো চিতার এলাকায় সে-ভরসা পাচ্ছিল না সে। দিবাবসানের সাথে সাথে আর একটা ভয়ঙ্কর রাতের অপেক্ষায় ছিল যুবকটি, এই সময় করবেটকে পেয়ে যেন হাতে চাঁদ পেল সে। সাথে সাথেই দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে উঠানে। করবেট কে এবং কেন এসেছেন জানার পর প্রায় কেঁদে উঠে তাঁকে মিনতি করল যুবকটি, 'আমি এখন কি করব, সাহেব? এক্ষুণি চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে আমার বউকে বাঁচান যাবে না।'

কি করবেন ভেবে ঠিক করতে পারলেন না করবেট। ওখান থেকে কমপক্ষে পঁচিশ মাইল দূরে আলমোড়া। এই পঁচিশ মাইলের মধ্যে কোনরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। মেয়েটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হলে ওই পঁচিশ মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে করবেটকেই। যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আগামী দিন দুপুরের আগে কিছুতেই ডাক্তারী সাহায্য পাওয়া যাবে না। কারণ ওই পাহাড়ী এলাকায় পায়ে হাঁটা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। যানবাহন ওখানে অচল। ততক্ষণ পর্যন্ত মেয়েটি বাঁচবে কিনা কে জানে! মেয়েটাকে একবার দেখা দরকার ভেবে যুবককে নিয়ে গিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন করবেট।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটি। বয়স সম্ভবত আঠার। লোকটি মেয়েটির হাত ধরে টানাটানি করার ফলে মেয়েটিকে আটকাবার জন্যে তার বুকে থাবার নখ বসিয়ে দেয় চিতাটা।

এতে বুকের কাছটায় চিরে গিয়ে চারটে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। গলার আর বুকের ক্ষতগুলোর আশপাশে মাছি ভন ভন করছে। জানালাশূন্য ঘরটার মাত্র একটি দরজা, তার ওপর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ থাকায় কল্পনাতীত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে ঘরের বাতাস। অসহ্য যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে ককিয়ে উঠছে মেয়েটি।

পরিষ্কার বুঝলেন করবেট, ঠিক এই মুহূর্তে সর্বাধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেও মেয়েটিকে বাঁচান যাবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং তখন আর আলমোড়া যাবার কোন মানে হয় না। এই সময় অন্য কথা ভাবলেন করবেট। মেয়েটি তো প্রায় শেষই, এই সময় তিনি চলে গেলে লোকটির অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে পড়তে পারে। কারণ একজন লোকের পক্ষে একদিন একরাতে যতটা সহ্য করা সম্ভব তা সে করেছে। তারপর আর একটা রাত ওই আহত মেয়েটির সাথে রাত কাটাতে গেলে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবে যুবকটি। ফিরে এসে মানুষখেকোর সে ঘরে ঢোকার সম্ভাবনাটাও একেবারে কম নয়। সুতরাং ওই বাড়িতেই রাত কাটিয়ে দেবেন মনস্থ করলেন করবেট। ঝুল বারান্দা দেয়া ঘরটা দৈর্ঘ্যে পনের ফুট হবে, সামনের বারান্দাটাও পনের ফুট লম্বা এবং চার ফুট চওড়া। পাইনের তক্তা লাগিয়ে বারান্দায় ওঠার সিঁড়ি তৈরি হয়েছে। সিঁড়ির উপরের প্রান্তের উল্টো দিকেই ওই একটি মাত্র দরজা। বারান্দার নিচের ফাঁকা জায়গায় জ্বালানী কাঠ রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

যুবকটির যথেষ্ট অনুরোধ সত্ত্বেও ওদের স্বামী স্ত্রীর সাথে একঘরে থাকতে রাজি হলেন না করবেট। ওই ঘরের তীব্র পচা গন্ধ মানুষের সহ্য ক্ষমতার বাইরে, তাছাড়া চিতাটা এলে ঘরে বসে থেকে ওটার বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব নয় করবেটের পক্ষে। লোকটি আর করবেট মিলে জ্বালানী কাঠ রাখার জায়গাটার একটা অংশ পরিষ্কার করে নিলেন। রাতের বেলা আর পেটে কিছু পড়বে না ভেবে, অগত্যা কাছেই একটা ঝরণায় গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে পেট ভরে পানি খেয়ে এলেন করবেট। বাড়িটাতে ফিরে এসে লোকটাকে বললেন, ঘরের দরজা যেন সে বন্ধ না করে। এতে অন্তত কিছুটা তাজা হাওয়া ঘরে ঢুকতে পারবে। করবেটের কথা শেষ হলে জিজ্ঞেস করল যুবকটি, "সাহেব, বাঘটা তোমাকে খাওয়ার পর কি করব আমি?'

যুবকটির কথায় না হেসে পারলেন না করবেট। ধরেই নিয়েছে সে, সে রাতে মানুষখেকোটার ডিনার হতে যাচ্ছেন করবেট। হাসতে হাসতেই জবাব দিলেন করবেট 'কি আর করবে, আমি মরার পর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভোরের অপেক্ষায় থাকবে।' বলে একটু আগে পরিষ্কার করা বারান্দার অন্ধকার কোণটিতে গিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসলেন তিনি।

দু'রাত আগে পূর্ণিমা গিয়েছে। তাই এ রাতে কিছুক্ষণ অন্ধকার থাকবে। এই অন্ধকার সময়টুকুর জন্যেই চিন্তিত করবেট। যুবকটির কথা মতো যদি ভোর পর্যন্ত দরজা আঁচড়ে থাকে চিতাটা, তাহলে বেশি দূরে যায়নি সে।

কে জানে, অদূরের কোন ঝোপের আড়ালে বসে এখন করবেটকে লক্ষ্য করছে কিনা মানুষখেকোটা? খুব সতর্ক ভাবে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থেকে চাঁদ ওঠার অপেক্ষা করতে লাগলেন করবেট। খুব ধীরে ধীরে কাটছে মুহূর্ত-গুলো। এক একটা সেকেণ্ডকে এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে। এই সময় হঠাৎ একটা শেয়াল ডেকে উঠল। থেমে থেমে আতঙ্কিত ভাবে ডেকেই চলেছে শেয়ালটা। শিকার ধরতে গিয়ে অথবা মড়ির দিকে এগোবার সময় অত্যন্ত ধীরে হাঁটে চিতারা। শেয়ালের ডাক শুনেই বোঝা গেল বিপদ দেখতে পেয়েছে শেয়ালটা। মানুষখেকোটাকে দেখেই চেঁচাচ্ছে কিনা ওটা কে জানে? সুতরাং আরও সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করলেন করবেট। চাঁদ তখনও না উঠলেও আকাশে তারা আছে, সেই তারার আলোয় গুলি করতে অসুবিধে হবে না করবেটের।

অত্যন্ত মন্থর গতিতে গড়িয়ে চলেছে সময়। শেয়ালের ডাক আর শোনা যাচ্ছে না। ক্রমেই ফর্সা হয়ে উঠছে পুবের আকাশ। একটু পরই চাঁদ উঠল পাহাড়ের মাথায়। আলোর বন্যায় ভেসে গেল করবেটের সামনের উঠোন। উঠোনের বাইরে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট ঝোপঝাড়গুলোর দিকে চেয়ে হঠাৎ শির শির করে ওঠে গা। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ঝোপ-গুলোর উপরিভাগ, তার নিচেই অন্ধকার। ওই অন্ধকারের দিকে চাইলেই মনে হয়, ছায়ার ভেতর ওত পেতে বসে

আছে চিতাটা। আকাশ নির্মেঘ। হাওয়াও নেই। স্থির হয়ে আছে গাছের পাতা। চারদিকটা নিথর, নিস্তব্ধ। এক-টানা এই নিস্তব্ধতা পাগল করে দিতে পারে মানুষকে। হঠাৎ গভীর নিঃশব্দতা খান খান করে দিয়ে আর্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। একবার, তারপরই বুক ভাঙা গোঙানী বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে। মাঝখানে কিছুক্ষণ কাতরায়নি সে। বুঝলেন করবেট, মেয়েটির সময় ঘনিয়ে এসেছে। বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল তাঁর মনটা। বাঘ বা চিতার দ্বারা গলায় আহত কোন মানুষের কষ্ট আর কাতরানীর সাথে তুলনা করা যায় দুনিয়াতে এমন মর্মান্তিক আর কিছু নেই। এর থেকে রোগী বা রোগিনীকে অব্যাহতি দেবার একমাত্র উপায় তাকে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর জন্যে গুলি করা, বা তার চেয়ে সহজ কোন উপায়ে মেরে ফেলা।

ওই কাতরানির শব্দে সময় যেন আরও মন্থর হয়ে গেল। তবুও মিনিট কাটল, মিনিট থেকে ঘণ্টা। করবেটের মাথার ওপর উঠে এল চাঁদ, আস্তে আস্তে হেলতে শুরু করল পশ্চিম আকাশে। এই সময়ই টের পেলেন করবেট আসল বিপদ। চাঁদ হেলতে শুরু করতেই তাঁর সামনের জায়গাটায় ঘরের ছায়া পড়ল, ক্রমেই লম্বাটে হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকল সে ছায়া। আগেই করবেটকে দেখে থাকলে ওই ছায়াটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছে চিতাটা। ছায়াটুকু বাড়তে বাড়তে সামনের উঠোনটা ঢেকে গেলেই সে আসবে, ছায়ায় গা ঢেকে, ছায়ার মতই নিঃশব্দে। জীবনে প্রতীক্ষার যে

ক'টা ভয়ঙ্কর আর দীর্ঘ রাত কাটিয়েছেন করবেট এটা তেমনি এক রাত। কিন্তু দীর্ঘ হলেও শেষ হয় রাত। দশ ঘণ্টা আগে যেখান দিয়ে চাঁদ উঠেছিল সেখান দিয়েই উঠল ঝলমলে লাল সূর্য।

আর অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই। বারান্দার নিচ থেকে বেরিয়ে এলেন করবেট। এতক্ষণ এক জায়গায় ঠায় বসে থেকে থেকে ব্যথা হয়ে গেছে তাঁর সমস্ত শরীর। রাইফেলটা মাটিতে নামিয়ে রেখে শরীরের জড়তা দূর করার চেষ্টা করলেন তিনি। এর আগের রাতে ঘুমাতে না পারায় গতরাতের শেষ দিকে গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল যুবকটি। করবেট ডাকতেই সে ঘুম থেকে উঠে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। ক্ষিদেয় চোঁ চোঁ করছে করবেটের পেটের ভেতর। যুবকটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আট মাইল দূরের ডোল ডাকবাংলোয় যাবার জন্যে রওনা দিলেন করবেট।

নিজের লোকজনদের সাথে পথেই দেখা হয়ে গেল করবেটের। তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে শঙ্কিত হয়ে তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছিল ওরা। আসার সময় যে ডাকবাংলোতে উঠেছিল, তার সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দিয়ে একেবারে সমস্ত মালপত্র নিয়েই এসেছে তারা।

করবেট ওদের সাথে কথা বলার সময়ই একজন রোড-ওভারশিয়ার সেখানে এসে হাজির। একটা ভুটিয়া টাট্টুতে চেপে আলমোড়া চলেছে ওভারশিয়ার। লোকটা করবেটের চেনা। ষ্টিফের কাছে একটা চিঠি পৌঁছে দেবার জন্যে তাকে

অনুরোধ করলেন করবেট। বিনা বাক্য ব্যয়ে রাজি হয়ে গেল ওভারশিয়ার।

করবেটের চিঠি পাওয়ার পর মুহূর্ত-মাত্র সময় নষ্ট না করে সেদিন আহত মেয়েটার সাহায্যার্থে মেডিকেল টীম পাঠিয়েছিলেন ষ্টিফ। কিন্তু ডাক্তার এসে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই সব সাহায্যের বাইরে চলে গিয়েছিল মেয়েটি। সেই দিনই সকাল ন'টায় মারা যায় সে।

হাতে ছুটি ছিল না বলে সে যাত্রা চিতাটাকে না মেরেই নৈনিতাল ফিরে এসেছিলেন করবেট।

*

সেই বছরেরই দশই সেপ্টেম্বর চিতাটাকে মারার জন্যে তৃতীয়বারের মত তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন করবেট। চিতাটাকে প্রথম মারার চেষ্টা করেছিলেন তিনি ওই বছরেরই এপ্রিলে এবং গিয়ে পড়েছিলেন এক মন্দির-আশ্রিত বাঘের পাল্লায়, সে কাহিনী আগেই বলা হয়েছে।

এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর, শুধু এই ক'মাসের মাঝেই প্রায় চল্লিশজন মারা গিয়েছিল চিতাটার হাতে। হিসেব করে দেখা গেছে রুদ্রপ্রয়াগের সেই কুখ্যাত চিতার চেয়ে প্রায় চারগুণ বেশি মানুষ খুন করেছিল পানারের মানুষখেকো চিতাটা। কিন্তু রুদ্রপ্রয়াগের চিতাটা হিন্দু তীর্থযাত্রীদের যাত্রা পথে পড়ায় এবং তাদের আক্রমণ করায় তার কথা ছড়িয়েছিল বেশি।

এবারেও একজন ভৃত্য ও চারজন কুলি নিয়েই রওনা

হলেন করবেট। ভোর চারটায় বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ই মেঘ করেছিল আকাশে। মাত্র কয়েক মাইল পথ যাবার পরই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সারাদিন বৃষ্টি মাথায় করে আটাশ মাইল পথ পেরিয়ে চুপচুপে ভিজে অবস্থায় গিয়ে আল-মোড়া পৌঁছুলেন তাঁরা। করবেটের ইচ্ছে ছিল ষ্টিফের ওখানেই রাতটা কাটান। কিন্তু ওই অবস্থায় ওখানে যেতে মন চাইল না তাঁর, তাই ডাকবাংলোতেই উঠলেন তিনি। এই দুর্যোগের রাতে কোন অতিথি নেই ডাকবাংলোয়। ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার লোকটি দুটো ঘরের তালা খুলে দিয়ে করবেট এবং তাঁর লোকজনের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। বড় করে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে অল্প সময়েই কিছু কাপড় চোপড় শুকিয়ে নিলেন করবেট। পরদিন সকালের মধ্যেই সমস্ত কাপড় আর জিনিসপত্র শুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার উপযোগী করে তুলল তাঁর লোকেরা।

যে বাড়িতে পানারের মানুষখেকো চিতার দ্বারা আহত হয়ে মারা গিয়েছিল মেয়েটি, সেখান থেকেই মানুষখেকো মারার অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন করবেট। কিন্তু সকালে নাস্তা করতে বসেছেন তিনি, এমন সময় পানোয়া নামে এক রাজমিস্ত্রী এসে হাজির। পানোয়াকে আগে থেকেই চেনেন করবেট। নৈনিতালে করবেটের বাড়ির কিছু কাজ করে দিয়েছিল সে। পানার উপত্যকাতেই তার বাড়ি। এখানে বাংলোর কেয়ারটেকারের সাথে দেখা করতে এসেছে পানোয়া। করবেট মানুষখেকো মারতে যাচ্ছেন শুনে তাঁর

সঙ্গী হতে চাইল সে। বহুদিন হল বাড়ি থেকে বেরিয়েছে পানোয়া, কিন্তু সঙ্গী পাচ্ছে না বলে ফিরে যেতে পারছে না। একা একা মানুষখেকোর এলাকার মধ্যে দিয়ে যাবার সাহস হয়নি তার। ওকে সাথে নিতে আপত্তি নেই করবেটের। কারণ ওই অঞ্চলে বাড়ি হওয়ায় এখানকার পথঘাট সব ওর জানা থাকায় সুবিধেই হবে। তার পরামর্শেই দাবিধুরা ছেড়ে পিথোরাগড়ের পথ ধরলেন করবেট। সারাদিন হেঁটে পানোয়ালালার ডাকবাংলোয় পৌঁছুলেন সাঁঝের বেলা। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে রওনা হলেন আবার। মাইল কয়েক যাবার পর পিথোরাগড় রোড ছেড়ে ডানদিকে নেমে পড়লেন অভিযাত্রীরা। এখানে পথ ঘাটের কোন ঠিক ঠিকানা নেই। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাবার পায়ে চলা পথ ছাড়া আর কোন পথও নেই। তাও বহুদিন চিতাটার ভয়ে অব্যবহৃত থাকার ফলে আগাছা জন্মে জন্মে রাস্তা আর চেনার উপায় নেই।

অভিযাত্রীদের অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর। কারণ চলার পথে চিতাটার ব্যাপারে আশপাশের প্রত্যেকটা গ্রামে খোঁজ-খবর করতে করতে এগোচ্ছে তারা। বেশ দূরে দূরে গ্রামগুলো কয়েকশো বর্গ মাইলের মধ্যে ছড়ানো। সালান বরগোত পট্টি পার হয়ে চারদিন পর সাঁঝের বেলা দলবল সহ চাক-তিতে এসে পৌঁছুলেন করবেট। এখানেই গ্রামের মোড়লের কাছে জানা গেল, দিন কয়েক আগে সানৌলিতে চিতার আক্রমণে মানুষ মারা পড়েছে।

চাকতি আর সানৌলির মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে পানার নদী। একটানা অঝোর বর্ষণে তখন বান ডেকেছে পানার নদীতে। নদী পারাপারের জন্যে এখানে কোন সেতু নেই, সুতরাং প্রবল স্রোত ঠেলে সে রাতে ওপারে যাওয়া সম্ভব হল না করবেটের পক্ষে। ওই গ্রামেই তাঁদের থেকে যেতে অনুরোধ করলো চাকতির মোড়ল, সকালে করবেটের সাথে একজন পথ প্রদর্শক দেবে এই প্রতিশ্রুতি দিল সে। অতএব থেকে যাওয়াই ঠিক করলেন করবেট।

মোড়লের বাড়িটা দোতলা। নিচে-উপরে অনেকগুলো কামরা। উপর তলায় দুটি কামরা করবেট আর লোকজনকে ছেড়ে দিল মোড়ল। কিন্তু উপরে থাকতে রাজি হলেন না করবেট। নিচ তলার এক কোণে একটা খালি কামরা চোখে পড়েছিল তাঁর, তাঁকে সেই কামরাটি ছেড়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করলেন মোড়লকে করবেট। রাজি হয়ে গেল মোড়ল। কামরাটার দরজায় কোন কপাট নেই। কিন্তু কোন ক্ষতি নেই তাতে। এসব এলালায় একমাত্র মানুষ-খেকো ছাড়া রাতের বেলা চোর ডাকাত বা ওই জাতীয় কিছুর উপদ্রব ঘটে না। আর সে রাতে মানুষখেকোর ভয়ও ছিল না, কারণ সানৌলিতে মানুষ মারার দিন কয়েক আগে থেকেই বান ডেকেছিল পানার নদীতে, ওই প্রবল স্রোত ঠেলে এপারে আসতে পারবে না চিতাটা।

আসবাবপত্রের বালাই নেই কামরাটায়। মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা খড়কুটো, ন্যাকড়া ইত্যাদি ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে

ফেলল করবেটের লোকেরা। বোঝাই গেল অত্যন্ত নোংরা প্রকৃতির ছিল এ ঘরের আগের বাসিন্দাটি। মেঝেতে সতরঞ্চি পাতা হতেই তার ওপর আরাম করে বসলেন করবেট। উঠানের এককোণে আগুন ধরিয়ে রান্না শেষ করল করবেটের ভৃত্য। রাতের খাওয়া শেষ হলে বিছানায় শুয়ে পড়লেন করবেট। তাঁর লোকেরা উপর তলার একটা ঘরে জায়গা করে নিল। গত বার ঘণ্টা একটানা পরিশ্রম করায় শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন করবেট।

ঘরের ভেতর কিসের শব্দ হতেই ঘুম ভেঙে গেল করবেটের। চোখ মেলতেই দেখলেন সোনালী আলোয় ভরে গেছে সারা ঘর। খোলা দরজা জানালা দিয়ে মেঝেয় এসে পড়েছে সকালের কাঁচা রোদ। করবেটের পায়ের কাছে বসে আছে একটি লোক। বছর পঞ্চাশ বয়সের লোকটিকে দেখেই চমকে উঠে বসলেন করবেট। লোকটির সারা গায়ে থক থক করছে গলিত ঘা। করবেট উঠে বসতেই সে ফ্যাঁশফ্যাঁশে গলায় করবেটের রাতটা কেমন কেটেছে জানতে চাইল। জবাব দিলেন না করবেট। তাতে কিছু মনে করল না লোকটা। করবেট জবাব দেবেন সে আশাও সে করেনি। হয়-তো বহুদিন ধরেই প্রশ্ন করে কারো কাছ থেকে কোন জবাব পায় না সে। সবাই এড়িয়ে চলে ওকে এবং এটাই স্বাভাবিক। কোন প্রশ্ন না করেও লোকটার কথা থেকেই জানলেন করবেট, গত দু'দিন পাশের গাঁয়ের এক বন্ধুর বাড়িতে কাটিয়েছে সে। আজ ভোরে ফিরে এসে করবেটকে তার ঘরে ঘুমোতে

দেখে বিছানার পাশে বসে করবেটের ঘুম ভাঙার প্রতীক্ষা করছিল। এই ঘরে রাত কাটিয়েছেন বলে নিজের ওপরই রাগ হল করবেটের। আসলে মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে ছোঁয়াচে আর ভয়াবহ রোগ এই কুষ্ঠ। সমস্ত কুমায়ুনে বিশেষ করে আলমোড়া জেলায় তখন এর প্রকোপ অত্যন্ত বেশি ছিল। এখানকার অধিবাসীরা অদৃষ্টবাদী হওয়ায় রোগটাকে ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্তি বলে মেনে নিত। সংক্রামিত লোকদের আলাদা করে রাখতো না তারা, আর এর প্রতিরোধেরও কোন চেষ্টা করতো না। সুতরাং করবে কে সতর্ক করার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি গাঁয়ের মোড়ল।

আর একমুহূর্ত দেরি না করে জামাকাপড় পরে বাইরে বেরিয়ে এলেন করবেট। তৈরি হয়েই বসে ছিল মোড়লের নির্বাচিত পথ প্রদর্শক। সাথে সাথেই সানৌলির উদ্দেশে রওনা দিলেন করবেট। চলতে চলতে প্রথম ঝরণাটা চোখে পড়তেই সঙ্গের সবাইকে থামতে বললেন তিনি। চাকরটিকে নাশতা তৈরি করতে আর কয়েকজন লোককে কার্বলিক সাবান দিয়ে সতরঞ্চিটা ভাল করে ধুয়ে নিতে বলে ঝরণার দিকে এগোলেন করবেট। এক জায়গায় কতগুলো পাথরের মাঝখানে একটু জলা মত হয়ে আছে। গতরাতে নিজের পরনে যত জামাকাপড় ছিল সব কার্বলিক সাবান দিয়ে ভালমত ধুয়ে নিলেন করবেট। পাথরের ওপর কাপড়গুলো ছড়িয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সাবান ঘষে স্নান করলেন তিনি।

প্রায় দু'ঘণ্টা পর জামাকাপড়গুলো একটু শুকিয়ে এল। সেই কাপড় পরে ফিরে এলেন করবেট। এতক্ষণে নিজেকে একটু ঝর ঝরে মনে হচ্ছে তাঁর।

স্নান আর খাওয়ায় পর অন্য কথা বলার একটু অবসর পেলেন করবেট। পথপ্রদর্শক লোকটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'চড়াই বেয়ে উঠতে হবে কি আমাদের ?'

করবেটের কথার উত্তরে মাত্র সাড়ে চার ফুট লম্বা, শরীরের তুলনায় প্রকাণ্ড মাথায় লম্বা চুলের গোছা, জালার মত শরীর, ছোট ছোট পা আর স্বল্প ভাষী লোকটা শুধু হাতের চেটো কাত করে কি রকম পথে চলতে হবে তা বুঝিয়ে দিল করবেটকে।

পথ প্রদর্শকের পিছু পিছু প্রায় খাড়া নেমে যাওয়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এক উপত্যকায় নেমে এলেন করবেট। ভেবেছিলেন উপত্যকা ধরে ধরে নদীর মোহনা পর্যন্ত নিয়ে যাবে তাঁদের পথপ্রদর্শক। কিন্তু সোজা সামনের জমিটা পার হয়ে উল্টো দিকের পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল সে, তার পেছন পেছন করবেট এবং তাঁর দলবল। শুধু খাড়াই নয় এখানে পাহাড়টা, সারা গায়ে এর কাঁটা ঝোপে ভর্তি, এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে অসংখ্য আলগা টুকরো পাথর। এসব পাথরে পিছলে গিয়ে প্রায়ই হোঁচট খেয়ে পড়তে হচ্ছে অভিযাত্রীদের। ওদিকে মাথার ওপরে উঠে এসেছে সূর্য। পথ চলা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। কিন্তু পথ প্রদর্শক লোকটি যেন পাহাড়ে চড়ার জন্যেই জন্মেছে। একটিবারও হোঁচট

না খেয়ে, কাঁটা ঝোপ এড়িয়ে তর তর করে পাহাড় বেয়ে উঠতে থাকল সে।

বহুকষ্টে শেষ পর্যন্ত চূড়ায় যখন উঠলেন অভিযাত্রীরা হাঁপরের মত ওঠা নামা করছে সবার বুক, ঘেমে নেয়ে গেছে সারা গা। কিন্তু নির্বিকার ভাবে এই প্রথম কথা বলল প্রদর্শক, 'এরকম আরো দুটো পাহাড় পেরোতে হবে আমাদের।'

শুনে তো ভিরমি খাবার জোগাড় করবেটের। ব্যাটা বলে কি! তাও এমন ভাবে বলল যেন কিছুই না, শুধু দুটো উই পোকার ঢিবি পেরোতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে গা থেকে কোটটা খুলে ফেলল পানোয়া। হাতের পোঁটলা আর কোটটা পদপ্রদর্শকের হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বলল সে, 'বেশ, বেশ, দুটো পাহাড় কেন, চারটে পেরোব। তা বাবা, তুমি যখন পাহাড় দুটো আমাদের চড়িয়েই ছাড়বে তখন এই পোঁটলাটা আর কোটটাকেও তোমাকেই বইতে হবে।'

পানোয়ার কথায় কিছুই মনে করল না পথ প্রদর্শক। কোমরে পেঁচিয়ে রাখা একটা ছাগলের লোমের দড়ি খুলে নিয়ে পোঁটলা আর কোটটা নিজের পিঠের সাথে আচ্ছা করে বেঁধে ফেলে ফের পাহাড় বেয়ে নামতে উঠতে শুরু করল সে। পানোয়ার এহেন ব্যবহারেও যখন দমে না গিয়ে চলতে শুরু করল পথ প্রদর্শক তখন তার প্রদর্শিত পথে না চলে আর উপায় কি। বার বার উপর নিচু করে করে, পা দুটোর

অবস্থা কাহিল করে শেষ পর্যন্ত দূরে এক গভীর উপত্যকার মধ্যে নদীর সন্ধান পেলেন অভিযাত্রীরা। এ পর্যন্ত কোন স্বাভাবিক পথ দিয়ে হাঁটেননি তাঁরা। এখন চোখে পড়ল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটা সরু পায়ে চলা পথ নেমে গেছে নদীর ধার পর্যন্ত। ঢাল বেয়ে যতই নদীর দিকে এগোতে থাকলেন ততই নদীর চেহারা দেখে ওটা পেরোতে পারবেন কিনা সেই সন্দেহ বাড়তে থাকল করবেটের। পথটা সোজা নদীতে নেমে গিয়ে নদীর ওপার থেকে আবার উঠে গেছে সোজা। বোধহয় শুকনোর দিনে এক ফোঁটা পানি থাকে না নদীতে, তখন ওই পথই যোগাযোগ স্থাপন করে চাকতি আর সানৌলির। কিন্তু বছরের এই সময় নদীর অবস্থা দেখলে কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন। সগর্জনে বয়ে চলেছে চল্লিশ গজ চওড়া পানির স্রোত, মাঝে মাঝেই এখানে ওখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল সব পাথরের চাঁই। যেন কোনমতে টিকে আছে তোড়ের মুখে।

নদীর ধারে পৌঁছেই থমকে দাঁড়ালেন করবেট। কিন্তু অভয় দিল তাঁকে পথপ্রদর্শক, নদী পেরোনো নাকি কঠিন কিছু নয়। ওর কথা মত জুতা মোজা খুলে ভয়ে ভয়ে পানিতে পা ডোবালেন করবেট। সত্যি কথাই বলেছিল পথপ্রদর্শক নদীটা সহজেই পেরিয়ে গেলেন তিনি শুধু বার কয়েক পিচ্ছিল পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়া ছাড়া আর তেমন কোন অসুবিধে হল না তাঁর। কিন্তু বেশি কেরামতি দেখাতে গিয়ে প্রায় মরতে বসল পথপ্রদর্শক নিজেই।

করবেট এবং অন্যদের পেছনে পেছনেই নদীতে নেমেছিল সে। অন্যদের যেখানে উরু পর্যন্ত ডুবছে তার সেখানে কোমর পানি। নদীর মাঝামাঝি তীব্র স্রোতের কাছে পৌঁছে উবু হয়ে আস্তে আস্তে স্রোত ঠেলে না এগিয়ে সে পাহাড়ে ওঠার মত সোজা এগিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু পাহাড়ে চড়ার কায়দার কাছে পরাস্ত হতে রাজি হল না পাহাড়ী নদীর তীব্র স্রোত। এক ধাক্কায় চিৎ করে ফেলে দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলল সে পথপ্রদর্শককে। এসব পাহাড়ী স্রোতের কাছে অসহায় বোধ করেন করবেট, কাজেই ছোট্ট মানুষটিকে কিভাবে সাহায্য করবেন ভেবে বুদ্ধি বের করতে পারলেন না। কিন্তু অত সব ভাবাভাবির ধার দিয়েও গেল না পানোয়া, হাতের পোঁটলাটা (পাহাড় থেকে নেমেই পথ-প্রদর্শকের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিল সে) একটা চ্যাপ্টা পাথরের ওপর ফেলে দিয়েই দৌড় দিল। এ পাথর থেকে ও পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ গজ ভাটিতে প্রপাতের মুখে বেরিয়ে থাকা একটা বিশাল পাথরের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে। অসহায় ভাবে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে পানোয়ার দিকেই ভেসে আসছে পথপ্রদর্শক। ভাসতে ভাসতে সে পানোয়ার কাছাকাছি আসতেই খপ করে তার লম্বা চুলের গোছা মুঠো করে ধরে ফেলল পানোয়া। তারপর শুরু হল পাহাড়ী স্রোত আর মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই (পরে এই লড়াইএর কথা বন্ধুদের কাছে বলতে গিয়ে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেছে করবেটের)।

ইঁদুর ছানার মত চার হাত-পা শূন্যে তুলে ভেসে যেতে চাইছে পথপ্রদর্শক, আর তার চুল ধরে টেনে রাখছে পানোয়া। এক হাতে পাথরের কিনারা খামচে ধরে নিজেকে ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে হচ্ছে বলে দুটো হাত ব্যবহার করতে পারছে না পানোয়া, তবে শেষ পর্যন্ত পথপ্রদর্শককে পাথরটার ওপর টেনে তুলতে পারল সে। পাথরটার ওপর বসে বসে ভেজা বেড়াল ছানার মত কাঁপতে থাকল পাহাড় চড়া বীর, তার তখনকার সে অবস্থা সত্যিই করুণ।

নিজের জীবন বিপন্ন করে পথপ্রদর্শককে বাঁচানোয় বার বার ধন্যবাদ দিলেন করবেট পানোয়াকে। কিন্তু তাকে ধন্যবাদ দেওয়ায় অবাক হয়ে গেল পানোয়া। বলল, 'ধন্যবাদ দিচ্ছেন কেন, সাহেব? ওই ইঁদুরের বাচ্চাটাকে বাঁচাতে গেছি নাকি আমি? দেখছেন না ওর পিঠে বাঁধা রয়েছে আমার নতুন কোটটা?'

তা পানোয়া যে উদ্দেশ্যেই বাঁচাক, একটা দুঃখজনক পরিণতি থেকে বেঁচে গেছে পথপ্রদর্শক। এতগুলো পাহাড়ে ওঠা নামা করার পর নদী পেরিয়ে এসে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন করবেট আর তাঁর দলবল। সাঁঝও হয়ে আসছে। রাতটা নদীর তীরেই কাটাবেন বলে স্থির করলেন করবেট। নদীর ধার ধরে পাঁচ মাইল উজানে উঠে গেলেই পানোয়ার গ্রাম। করবেটের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল সে, যাবার সময় পথপ্রদর্শককেও সাথে করে নিয়ে গেল। নেবার আগে অবশ্য প্রদর্শকের হয়ে বলে গেল, একটু আগের ওই

বিশ্রী ঘটনাটার পর সেদিন আর নদী পেরোনোর ইচ্ছে নেই পথপ্রদর্শকের। কথাটা একাংশে ঠিক হলেও আসলে মানুষখেকোর এলাকায় একা পথ চলতে সাহস পায়নি পানোয়া, তাই পথপ্রদর্শককে সঙ্গী হিসেবে নিয়ে গেছে ও।

*

পরদিন ভোরেই দলবল সহ আবার রওনা দিলেন করবেট। সারাদিন হেঁটে হেঁটে শেষ বিকেলের দিকে একটা উপত্যকায় এসে পৌঁছুলেন তাঁরা। উপত্যকা পেরিয়ে খোলা মাঠ, আশপাশে কোথাও লোক বসতি চোখে পড়ে না। ওই তেপান্তরের মধ্যেই রাত কাটানো ছাড়া উপায় নেই। মানুষখেকোর রাজত্বের অন্তঃস্থলে পৌঁছে গেছেন এখন অভিযাত্রীরা, সুতরাং হুঁশিয়ার থাকতে হবে। ভেজা, ঠাণ্ডা মাটিতে কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে পরদিন দুপুরের পর সানৌলিতে এসে পৌঁছুলেন তাঁরা। ছোট্ট গ্রামটির অধিবাসীরা তাঁদের দেখে খুব খুশি। অভিযাত্রীদের থাকার জন্যে একটা ঘর ছেড়ে দিল ওরা। করবেটের থাকার জায়গা হল ছাউনি ঢাকা একটা চারদিক খোলা ভিটায়। একটা নড়বড়ে চৌকিও আছে ছাউনির তলায়। পাহাড়ের একেবারে কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গ্রামটি। গাঁয়ের পাশের উপত্যকায় আর পাহাড়ের ধাপ কেটে চাষ করে ধান বোনা হয়েছিল, এখন তা কেটে ঘরে তোলা হয়েছে। ধানি জমির পর পাহাড়টা উঠে গেছে ধীরে ধীরে। চষা জমি থেকে শ'খানেক গজ দূরে বিশ একরের মত জায়গা জুড়ে

আগাছার জঙ্গল। আগাছার জঙ্গলের ওপারে পাহাড়ের চূড়ার কাছে আরেকটি গ্রাম। ক্ষেতের বাঁ দিকে উপত্যকার শেষ থেকে শুরু হয়ে ওদিকের পাহাড়ের অনেকদূর ওপর পর্যন্ত জমি ঘন ঘাসে ছাওয়া। অর্থাৎ আগাছার জঙ্গলের তিন দিকেই চষা জমি এবং বাকি এক দিকে ঘাস জমি।

রাতের খাবার যখন তৈরি হচ্ছিল তখন করবেটের চারপাশে বসে গল্প করছে অনেক লোক। মার্চের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এপ্রিলের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ওই এলাকায় চারজন লোক মেরেছে মানুষখেকোটা। পাহাড়ের মাঝামাঝি ওপরের গাঁয়ে নিহত হয়েছে প্রথমজন, দ্বিতীয় ও তৃতীয়জন নিহত হয়েছে চূড়ার কাছের গাঁয়ে, আর চতুর্থ অর্থাৎ শেষ মানুষটি মারা গেছে এই সানৌলিতে এবং মাত্র ছ'দিন আগে। এখানকার লোকেদের বিশ্বাস এখনো ওই আগাছার জঙ্গলেই আছে চিতাটা। এর কারণও অবশ্য আছে। চারজন লোককেই রাতের বেলা খুন করে পাঁচশ গজ দূরের ওই আগাছার জঙ্গলে বয়ে নিয়ে গেছে চিতাটা, তারপর আস্তে আস্তে রয়ে সয়ে তাদের খেয়েছে। ওই তিনটি গ্রামের কারোর কাছেই বন্দুক না থাকায় মৃতদেহগুলো উদ্ধারের ব্যবস্থাও করা যায়নি।

সেদিন সকালেই একটা গাঁয়ের ভেতর দিয়ে আসার সময় ওই গাঁ থেকেই দুটো ছাগল কিনে নিয়েছিলেন করবেট। সানৌলির লোকেদের ধারণা ঠিক কিনা বোঝার জন্যে আগাছার জঙ্গলের এক প্রান্তে একটা ছাগল বেঁধে রেখে এলেন তিনি। ওটার ওপর আর বসতে পারলেন

না, কারণ ধারে কাছে সুবিধামত কোন গাছ নেই। অবশ্য মাটিতে বসা যেত, কিন্তু আকাশে মেঘের রূপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে একটু পরই প্রবল বর্ষণ শুরু হবে। ছাউনির কাছাকাছিই বাঁধলেন দ্বিতীয় ছাগলটি। আশা, নধর ছাগল-টিকে একজন মানুষের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেবে চিতাটা। অনেক রাত পর্যন্ত ডাকাডাকি করল ছাগল দুটো। এতে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন করবেট, আশপাশে নেই চিতাটা। কাজেই সকাল সকালই ছাউনির নিচে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

সকালে ঘুম ভাঙতে দেখলেন নির্মেঘ আকাশের পুব দিকে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে সূর্য। রাতের বৃষ্টির পানিতে গাছের প্রত্যেকটি পাতা আর ঘাসের ধূলিবালি সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। তার ওপর রোদ পড়ে ওদের উজ্জ্বল রঙ আরও শত গুণে বেড়ে গেছে। গাছের ডালে আর ঝোপের ওপর নেচে বেড়াচ্ছে অসংখ্য রং বেরঙের পাখী। ওদিকের একটা গোলাপ ঝোপের ওপর বসে সূর্যের দিকে মুখ করে গলা ছেড়ে গাইছে কয়েকটা ধূসর বুলবুলি, যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সূর্যকে। চমৎকার সকাল। দিনটা ভালই কাটবে আশা করা যায়।

ছাউনির কাছে বাঁধা ছাগলটা গাছের নিচে পড়ে থাকা ঘাস পাতা চিবুচ্ছে আর থেকে থেকে আগাছার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে সঙ্গীকে ডাকছে, কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না সঙ্গী। চাকরকে নাশতা বানাতে বলে আগাছার জঙ্গলের দিকে

এগিয়ে গেলেন করবেট। নির্দিষ্ট জায়গায় ছাগলটা নেই। বৃষ্টি আসার অল্প আগে চিতার হাতে মারা পড়েছিল ছাগলটা। দড়ি ছিঁড়ে ছাগলটাকে নিয়ে গেছে চিতা, কিন্তু ওটাকে হিঁচড়ে নেবার দাগ চোখে পড়ল না। দাগটা বোধহয় ধুয়ে মুছে গেছে বৃষ্টির পানিতে। তবে তার জন্যে ভাবনা নেই। ছাগলের লাশটাকে কোথায় নিয়ে গেছে চিতা, জানা আছে করবেটের। মড়িটাকে লুকানোর এক-টাই জায়গা আছে—ওই আগাছার জঙ্গল। সব সময়েই চিতা বা বাঘের মড়ি বয়ে নেবার পথকে অনুসরণ করতে কর-বেটের ভাল লাগে। অবস্থা অনুকূলে থাকলে এভাবে অনুসরণ করে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে অবস্থা অনুকূল নয়, কারণ আগাছার জঙ্গলটা এত ঘন যে ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে এগোন যাবে না।

ছাউনিতে ফিরে এসে নাশতা সেরে নিয়ে গ্রামবাসী-দের ডেকে পাঠালেন করবেট। আশপাশের অঞ্চলটা সম্পর্কে তাদের সাথে পরামর্শ করা দরকার। মড়ির ওপরে বসার মত যথেষ্ট হাড়গোড় অবশিষ্ট আছে কিনা দেখতে হলে চিতাটাকে না ঘাঁটিয়ে উপায় নেই। কিন্তু কথা হল বিরক্ত হয়ে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে চিতাটা? আগাছার জঙ্গল থেকে দূরে আশ্রয় নেবার মত কোন জায়গা আছে কিনা তা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জেনে নেয়া দরকার।

গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে জানা গেল মাইল তিনেক দূরে লুকানোর মত জঙ্গল আছে। ওখানে যেতে হলে

আগাছার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সমস্ত পথটাই চিতাটাকে চষা খোলা জমির ওপর দিয়ে যেতে হবে। খুঁজে খুঁজে দুপুর নাগাদ মড়িটা পেয়ে গেলেন করবেট। খুর, শিং আর পেটের কাছটাই শুধু অবশিষ্ট আছে ছাগলটার। দিনের এই সময়ে দু'মাইলের বেশি পথ খোলা জমির ওপর দিয়ে কিছুতেই হেঁটে যাবে না চিতাটা, সুতরাং আগাছার জঙ্গলে খুঁজতে থাকলেন ওকে করবেট। বুলবুল, ড্রোঙ্গো, চড়াই আর বাবুই মিলে চিতাটার গতিবিধি জানিয়ে দিচ্ছে করবেটকে। খেদানো দলের সাহায্যে অবশ্য চেষ্টা করা যেত, কিন্তু তাতে ফল হবে উল্টো। চিতাটা মানুষখেকো, সুতরাং মানুষকে ভয় পায় না ওটা। যখন দেখবে ওকে তাড়িয়ে খোলা জায়গার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন ফিরে দাঁড়িয়ে যাকে সামনে পাবে সে তাকেই আক্রমণ করে বসবে।

ব্যর্থ হয়ে ছাউনিতে ফিরে এলেন করবেট। এসেই বুঝলেন, জ্বর আসছে—ম্যালেরিয়া। এর পর চব্বিশ ঘণ্টা আচ্ছন্নের মত ছাউনির নিচের ওই নড়বড়ে চৌকিতে পড়ে থাকলেন করবেট। পরদিন বিকেলের দিকে জ্বর ছাড়ল। আগের রাতে করবেট যখন জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ তখন নিজেরাই পরামর্শ করে প্রথম ছাগলটা যেখানে মারা পড়েছিল সেখানে দ্বিতীয় ছাগলটাকে বেঁধে রেখে এসেছিল গ্রামবাসীরা। কিন্তু মারা পড়ল না ছাগলটা। এতে একদিক থেকে ভালই হল। কারণ প্রথম ছাগলটা খাবার

পর আটচল্লিশ ঘণ্টা আর কিছুই পেটে পড়েনি চিতাটার। এখন নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত সে, সুতরাং এই রাতে ছাগলটা মারা পড়ার সম্ভাবনা আছে।

রাইফেল হাতে বেরিয়ে পড়লেন করবেট। প্রথম ছাগলটা যেখানে মারা পড়েছিল তার একশ গজ দূরে পাহাড়ের ধাপ কেটে তৈরি দুটো জমির মাঝখানের প্রায় দু'ফুট উঁচু আলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ওক গাছ। পাহাড়ের গায়ে একশ বিশ ডিগ্রী কোণ করে দাঁড়িয়ে গাছটা। রাবার সোলের জুতো পরে স্বচ্ছন্দে উঠে যেতে পারবেন করবেট ওতে। গাছের গোড়ার পাহাড়ের ঢাল থেকে প্রায় পনের ফুট উঁচুতে উপত্যকার দিকে মুখ করে একটা ডাল বেরিয়েছে এবং সারা গাছটায় ওই একটাই মাত্র ডাল। প্রায় ফুট খানেক পরিধির ডালের ভেতরটা পচা আর ফাঁপা। এটার ওপর বসা মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু কয়েকশো গজের মধ্যে আর কোন গাছ না থাকায় ঝুঁকি নিয়ে হলেও ওই ডালে বসাই স্থির করলেন করবেট, কারণ মানুষখেকো মারতে হলে ঝুঁকি নিতেই হবে।

একটা ব্যাপারে করবেট নিশ্চিত, ছাগল মারা চিতাটা মানুষখেকোটাই। গত এপ্রিলে যে বাড়িতে আহত হয়ে মেয়েটা মারা গিয়েছিল সে-বাড়ির উঠানে দেখা চিতার পায়ের ছাপের সাথে এ চিতাটার পায়ের ছাপের কোন তফাৎ নেই।

ছাউনিতে ফিরে গিয়ে নিজের লোকজনদের ডেকে আনলেন করবেট। নির্দেশ দিতেই অনেকগুলো কাঁটা গাছ কেটে আনল ওরা। গাছে উঠে বসে গাছের গোড়া থেকে শুরু করে তাঁর পায়ের নিচ পর্যন্ত কাঁটাগুলো বেঁধে দেয়ার নির্দেশ দিলেন করবেট ওদেরকে। কাঁটা লতাগুলোর কোন কোনটা প্রায় ত্রিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা। সেগুলো গাছের দু'ধারে লম্বা করে বেঁধে দেয়া হল। কতগুলো কাঁটা গাছ ডালের নিচে পাদানির মত করে বাঁধা হল। ধরে ভার-সাম্য রক্ষা করার মত করবেটের হাতের কাছে কিছুই নেই, তাই কয়েকটা কাঁটা গাছ মাথার ওপরে গাছের গায়ে শক্ত করে বাঁধা হল। প্রস্তুতি পর্ব শেষ করে হাতঘড়ি দেখলেন করবেট। বিকেল পাঁচটা।

ঠাণ্ডার হাত থেকে গলা বাঁচাবার জন্যে কোটের কলারটা টেনে ওপরে তুলে দিলেন করবেট। পেছন দিকে ঘাড়ের ওপর নামিয়ে দিলেন হ্যাটের এক প্রান্ত। তারপর ডালের দু'দিকে দু'পা দিয়ে গাছের গায়ে আরাম করে হেলান দিয়ে বসলেন তিনি। তাঁর সামনে ত্রিশ গজ দূরে খুঁটি পুঁতে ছাগলটাকে বেঁধে রেখে ওটার পাশে বসেই সিগারেট টানতে টানতে জোরে জোরে কথা বলতে লাগল করবেটের লোকেরা।

করবেট গাছটায় উঠে বসার পর থেকে একেবারে শান্ত ছিল আগাছার জঙ্গল, হঠাৎ ঝোপের ভেতর থেকে কর্কশ স্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে এল একটা ব্যাবলার পাখী। মিনিট কয়েক পরেই বিচিত্র কিচির মিচির আওয়াজ

করে বেরিয়ে এল কয়েকটা সাদা গলা বুলবুলি। এই দু'জাতের পাখীই সঠিক হুঁশিয়ারি জানাতে ওস্তাদ, এদের ইঙ্গিতের ওপর শতকরা একশ ভাগ নির্ভর করা যায়। পাখীগুলোর চেঁচামেচি শুনে করবেটের দিকে চাইল লোক-গুলো। হাতের ইশারায় ওদেরকে গ্রামে ফিরে যেতে বললেন করবেট। এখান থেকে চলে যেতে পেরে যেন খুশিই হল ওরা। www.boiRboi.blogspot.com

জোর গলায় কথা বলতে বলতে চলে গেল লোক-গুলো। ওদের গলার আওয়াজ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাকতে শুরু করল ছাগলটা, বিপদ টের পেয়েছে সে। কিন্তু কিছুক্ষণ ডেকেই থেমে গেল আবার।

তারপরের আধঘণ্টা আর কিছুই ঘটল না। পাহাড়ের ওপারে তখন ডুবতে বসেছে সূর্য। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগে আগাছার জঙ্গলের মাথায় শেষ পরশ বুলিয়ে গেছে দিনের পাহাড়ী হাওয়া, ওদের কাজ শেষ। একটু পর আবার আসবে হাওয়া, ওরা রাতের। চারদিকে একটা শান্ত সমাহিত ভাব। সূর্যটা পাহাড়ের ওপারে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল দুটো ড্রোঙ্গো। সামনের আগাছার জঙ্গলের ওপর একজায়গায় চক্কর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ডেকেই চলল ওরা। এতক্ষণ গ্রামের দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিল ছাগলটা। হঠাৎ সোটা পাঁই করে ঘুরে দাঁড়িয়ে করবেটের গাছটার দিকে মুখ করে আগাছার জঙ্গলের দিকে চেয়ে ডাকতে শুরু করল।

ড্রোঙ্গো দুটো আর একজায়গায় ঘুরে ঘুরে ডাকছে না এখন। বরং একটু একটু করে এগিয়ে আসছে করবেটের দিকে। রওনা হয়েছে তাহলে পানারের অভিশপ্ত মানুষখেকো। চারশো বোরের দো-নলা শটগানে স্লাগ ভরে নিয়ে তৈরি হয়ে থাকলেন করবেট।

আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। সুতরাং, রাতের প্রথম ভাগে বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকার থাকবে, করবেটের সাথে টর্চ নেই। তাই শটগানের মাথায় এক টুকরো সাদা কাপড় জড়িয়ে নিয়েছিলেন তিনি। তাতে নিশানা করার সুবিধে হবে। একটা কথা বলে রাখা দরকার, বাঘের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষিপ্র আর ধূর্ত চিতা। তাই চিতা মারতে হলে ভারী রাইফেলের চেয়ে হালকা শটগান অনেক বেশি উপযোগী।

ডেকে ডেকে বোধহয় ক্লান্ত হয়েই একসময় চলে গেল ড্রোঙ্গো দুটো। ওরা কোথায় গেল ভাবছেন করবেট, এমন সময় তাঁর নিচের গাছের সাথে বেঁধে রাখা কাঁটা ঝোপে মৃদু টান পড়ল। গাছটায় কাঁটাগাছ বাঁধার বুদ্ধিটা সময় মত মাথায় গজিয়েছিল বলে নিজেকে ধন্যবাদ দিলেন করবেট। তা নাহলে এতক্ষণে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটত তাঁর। মানুষখেকোটা যে এসে হাজির হয়েছে গাছতলায় এতে আর সামান্যতম সন্দেহও থাকল না করবেটের। প্রথমে কাঁটা লতার ওপর দিয়েই গাছে চড়ার চেষ্টা করল চিতাটা। এতে ব্যর্থ হয়ে কাঁটা লতার মাথা দাঁত দিয়ে কামড়ে

টেনে গাছ থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। এতেও সফল হল না দেখে হেঁচকা টান মেরে করবেটকে গাছ থেকে ফেলে দেবার সংকল্প করল সে।

আঁধার ঘনিয়ে এসেছে এখন। আঁধারেই মানুষ মারে চিতারা। বার বার করবেটের কাছে পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়ে দারুণ ক্ষেপে গেছে চিতাটা। কাঁটা লতাগুলো টানতে টানতে গর্জাচ্ছে সে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে চিতার গর্জনই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, বিশেষ করে যখন সে ক্ষেপে যায়। অবশ্য চিতাটা চুপ করে না থেকে গর্জাচ্ছিল বলে সুবিধেই হচ্ছে করবেটের, এতে জানোয়ারটা কখন, কোথায় কি অবস্থায় আছে বুঝতে পারছেন করবেট। বরং যখন ওটা চুপ করে যাচ্ছে তখনই ভয় পাচ্ছেন, কারণ এর পর সে কি করতে যাচ্ছে জানতে পারছেন না তিনি। এভাবে চলল বেশ কিছুক্ষণ। কালি গোলা অন্ধকারে এখন চারপাশের কিছুই চোখে পড়ছে না করবেটের। হঠাৎ একেবারে শান্ত হয়ে গেল চিতাটা। করছে কি ওটা? করবেটকে ধরার অন্য কোন মতলব আঁটছে? নাকি বিফল হয়ে চলে গেছে? এমন সময় কলজে পানি করে দিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল সে, সাথে সাথেই লতা ধরে এমন টান মারল যে গাছ থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন করবেট। এবার অন্য ফন্দি ধরল ভয়ঙ্কর ধুরন্ধর শয়তানটা। বেশ কিছুটা পিছিয়ে এসে ছুটে গিয়ে লাফিয়ে উঠে করবেটকে ধরার চেষ্টা করতে লাগল। কোনমতে একবার

তাঁকে ছুঁতে পারলেই হয়, পচা ফাঁপা ডাল ভেঙে মানুষ-শুদ্ধ নিয়ে মাটিতে পড়বে সে। এবার সত্যিই ভয় পেলেন করবেট।

বার কয়েক এভাবে লাফালাফি করে শেষ পর্যন্ত করবেটকে পাবার আশা বাদই দিল চিতাটা। আর একবার মাত্র চেষ্টা করেই ছাগলটার দিকে ছুট দিল সে। গুলি করার মত পর্যাপ্ত আলো থাকতে থাকতে চিতাটা আসবে মনে করে গাছ থেকে ছাগলটাকে ত্রিশ গজ দূরে বাঁধতে বলেছিলেন করবেট। কিন্তু এই নিঃশ্ছিদ্র অন্ধকারে বাঁচাতে পারলেন না তিনি ছাগলটাকে। একবার মাত্র আর্ত স্বরে ডেকে উঠেই মারা গেল ওটা। ছাগলটা সাদা রঙের, সুতরাং মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর অস্পষ্ট একটু সাদামত ছোপ চোখে পড়ল যেন করবেটের। চোখের ভুলও হতে পারে। কিন্তু না তো! একবার চোখে পড়ছে ছোপটা আবার মিলিয়ে যাচ্ছে, এ কি করে সম্ভব? হঠাৎ বুঝতে পারলেন তিনি ব্যাপারটা। আসলে ছাগলটাকেই দেখতে পাচ্ছেন করবেট। যখন ছাগলটার সামনে থেকে সরে যাচ্ছে চিতাটা তখনই ওটার সাদা ছোপ চোখে পড়ছে, যখনই ছাগলটাকে আড়াল করে দাঁড়াচ্ছে চিতা তখনই আর চোখে পড়ছে না। সাদা ছোপটার দিকে বন্দুকের নিশানা করে বসে রইলেন তিনি। যেই আরেকবার অদৃশ্য হল ছোপটা অমনি গুলি করলেন। গুলির শব্দের সাথে সাথেই রাগে চেঁচিয়ে উঠল চিতাটা। তারপরই দেখলেন করবেট একটা

আবছা ছায়ার মত কিছু একছুটে পাহাড়ের দিকে চলে গেল।

গভীর মনযোগের সাথে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলেন করবেট, কিন্তু চিতাটার দিক থেকে আর কোনরকম শব্দ শোনা গেল না। মিনিট পনের পার হয়ে যাবার পর গ্রাম থেকে চেঁচিয়ে জানতে চাইল তাঁর লোকেরা—ব্যাপার কি, এবং তারা আসবে কিনা। উত্তরে বললেন করবেট, পাইনের ডালের মশাল জ্বালিয়ে যেন উঁচু পথটা ধরে আসে ওরা। রেজিনে ভরা সদ্য কাটা পাইনের ডালগুলো বেশ পরিষ্কার আলো দেয়।

হাতে একটা করে মশাল নিয়ে জনা কুড়ি লোক হৈ চৈ করতে করতে করবেটের নির্দেশিত পথে এগিয়ে আসতে লাগল। তাঁর কাছে পৌঁছে ওরা গাছ থেকে কাঁটাগুলো সরাবার ব্যবস্থা করল। চিতাটার টানাটানিতে কাঁটা বাঁধা দড়িগুলোর গিঁট এত শক্ত হয়ে এঁটে গিয়েছিল যে দড়িগুলো কেটে ফেলে সরাতে হল কাঁটার দঙ্গল। গাছ থেকে ধরে নামাতে হল করবেটকে, কারণ ওই বিশ্রী আসনে বসে থেকে থেকে খিঁচ ধরে গিয়েছিল তাঁর পায়ে।

মশালের আলোয় ছাগলটাকে দেখা গেলেও চিতাটা যেদিকে পালিয়েছে সেদিকটা অন্ধকারেই থেকে গেল। গ্রামের লোকদের জানালেন করবেট, চিতাটাকে আহত করতে পেরেছেন তিনি, তবে কতটা মারাত্মক ভাবে ওটা আহত হয়েছে তা বলতে পারবেন না। আরও বললেন,

এই অন্ধকারে চিতাটাকে অনুসরণ করা ঠিক হবে না, দিনের বেলায়ই তা করতে হবে। কিন্তু এই কথায় অসন্তুষ্ট হল গাঁয়ের লোকেরা। তাদের ইচ্ছে আহতই যখন হয়েছে চিতাটা, এতক্ষণে মরেও তো গিয়ে থাকতে পারে? শেষ পর্যন্ত না দেখে ফিরে যাওয়া কেন? অন্ততপক্ষে যে দিকে পালিয়েছে চিতাটা সেদিকের জমির প্রান্ত পর্যন্ত কি দেখে যাওয়া উচিত নয়? সাথে বন্দুক আছে আর তারা দলেও বেশ ভারি। সুতরাং জমিটার প্রান্ত পর্যন্ত যেতে রাজি হলেন করবেট, তবে এক শর্তে। মশাল উঁচু করে ধরে তার পেছনে লাইন দিয়ে এগোবে গ্রামের লোক, আর চিতাটা হঠাৎ আক্রমণ করে বসলে করবেটকে অন্ধকারে ফেলে রেখে পালাতে পারবে না। রাজি হল ওরা। সুতরাং বন্দুক হাতে আগে আগে চললেন করবেট, তার পাঁচ গজ পেছনে অন্য সবাই। মরা ছাগলটার কাছ থেকে আরও গজ বিশেক দূরে জমির প্রান্ত। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে অতি ধীরে এগিয়ে চললেন করবেট। যতই সামনে এগোলেন জমির কাছের অন্ধকার মশালের আলোয় ততই দূর হয়ে যেতে থাকল। জমিটার ওপার পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এখন। আরো কয়েক গজ সামনে এগোতেই চোখে পড়ল জানোয়ারটা। ওর অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে গেছে বুঝতে পেরে একলাফে কয়েক গজ এগিয়ে এল চিতাটা। তারপর ভীষণ রাগে গর্জাতে গর্জাতে আক্রমণের প্রস্তুতি নিল সে। আক্রমণোদ্যত চিতার ওই ভয়াবহ গর্জনের শব্দে হাতির

পালকে পর্যন্ত পালাতে দেখেছেন করবেট।

চিতাটাকে আক্রমণোদ্যত দেখলে করবেটকে ফেলে পালাবে ওরা, একটু আগের এই প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেল গ্রামের লোকেরা। পিছন ফিরে একে অন্যের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে ছুট লাগাল ওরা। কয়েকজন হাতের মশাল আলগা ভাবে ধরে ছুটল, অন্যেরা তা মাটিতে ফেলেই দৌড় দিল। এক লাফে করবেটের সামনে চলে এল চিতাটা। মাটিতে পড়ে থাকা মশালগুলো তখনো জ্বলছিল। সেই আলোতেই চিতাটার বুক লক্ষ্য করে একবার গুলি করার সুযোগ পেলেন করবেট। গুলির শব্দ শুনে দৌড়ান বন্ধ করল পেছনের লোকেরা। যখন দেখল ওরা, চিতাটা আর ওদের আক্রমণ করতে আসছে না। গুটি গুটি পায়ে একজন দু'জন করে ফিরে এল ওরা। তাকে ফেলে পালিয়ে যাওয়ায় ওদেরকে দোষ দিতে পারলেন না করবেট। কারণ পরে তিনি বলেছিলেন, 'আমার হাতে বন্দুক না থেকে মশাল থাকলে সবার আগে দৌড়ে পালাতাম আমিই।'

করবেটের কাছ থেকে মাত্র হাত দশেক দূরে মরে পড়ে আছে চিতাটা। এখন ওকে দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না যে গত কয়েক বছরে চারশ'রও বেশি মানুষ খুন করেছে সে; বিশ্বাস করা যায় না এদিকের সমস্ত গ্রাম জুড়ে বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল ওই অপূর্ব সুন্দর প্রাণীটা।

গ্রাম থেকে আসার সময়ই বুদ্ধি করে চিতাটাকে বয়ে

নিয়ে যাবার জন্যে বাঁশ দড়িদড়া ইত্যাদি নিয়ে এসেছিল গ্রামের লোকেরা। বাঁশে বেঁধে কয়েকজনে বয়ে নিয়ে চলল মানুষখেকোটাকে। ক্লান্ত পদক্ষেপে ওদের পিছু পিছু হেঁটে চললেন করবেট। উত্তরের ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়ার ঝাপটায় ঠক ঠক করে কাঁপছেন তিনি। কিন্তু এতটা তো কাঁপার কথা নয়? বুঝতে পারলেন আবার জ্বর আসছে তাঁর—ম্যালেরিয়া।

বহুদিন পর সেদিন নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারল সানৌলির লোকেরা।

মানুষখেকো চিতা

গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় প্রায় সমস্ত জঙ্গলেই বাস করে চিতারা। বাঘেদের অনেক আগে থেকেই চিতার বাস ছিল ভারতীয় জঙ্গলে। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, তুলনামূলক ভাবে চিতার অনেক পরে উত্তরের ঠাণ্ডা অঞ্চল থেকে এখানে এসে হাজির হয়েছে বাঘেরা। প্রায় সবারই জানা আছে চিতার ইংরেজী নাম লেপার্ড। ইংরেজীতে যাদের চিতা (Cheetah) বলে ডাকা হয়, তারা সম্পূর্ণ আলাদা প্রাণী। দেখতে লেপার্ডের মত হলেও আকারে অনেক ছোট ওরা। দেহের তুলনায় মাথাটা ছোট থাকে চিতার, আর লেপার্ড থেকে এদের আলাদা করে চেনার এটাই সবচেয়ে বড় উপায়। ভারতের অনেক এলাকায়ই লেপার্ডদের প্যান্থার বলে ডাকা হয়, তবে চিতা নামেই সমধিক পরিচিত এরা।

সাধারণতঃ মানুষকে অত্যন্ত ভয় করে প্যান্থার বা চিতা বাঘ। যদি কখনও বাধ্য হয়ে আক্রমণ করতেই হয় তাহলে

শুধু দ্রুত কয়েকটা আঁচড় বা কামড় দিয়েই সরে পড়ে এরা। চিতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যে-কাহিনী বলার জন্যে বেঁচে থাকে অধিকাংশ লোকই, পক্ষান্তরে বাঘের বেলায় ঘটে এর ঠিক উল্টো।

কখনও কখনও এক আধটা চিতার মানুষ সম্পর্কে এই ভীতি চলে যায়, আর তখনই এরা হয়ে ওঠে ধ্বংসের প্রতিমূর্তি, হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর মানুষখেকো। আকারে ছোট হওয়ায়, গাছে চড়তে পারায় এবং অতুলনীয় ক্ষিপ্রতার দরুন. মানুষ খুন করার ব্যাপারে তার সমগোত্রীয় কিন্তু আকারে বড় বাঘের চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা পায় বলেই মানব মহলে তখন এরা রীতিমত ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

এমনি ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল গুম্মালাপুরের (Gummalapur) মানুষখেকো এক চিতা। মোটমাট বেয়াল্লিশ জন মানুষ খুন করেছিল এই কুখ্যাত চিতাটা। বুদ্ধিতে প্রায় মানুষের সমপর্যায়েই পৌঁছে গিয়েছিল সে। চিতাটার জ্বালায় দু'শ পঞ্চাশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে কিছুদিনের জন্যে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল মানুষ।

সূর্যাস্তের বহু আগেই বন্ধ হয়ে যেত প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি ঘরের দরজা। ভেতর থেকে খিল এঁটে দেয়ার পরও আরও নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে দরজায় ঠেস দিয়ে রাখা হত বাক্স-পেঁটরা, চেয়ার-টেবিল জাতীয় আসবাব-পত্র. আর পাহাড় থেকে কুড়িয়ে আনা বড় বড় পাথর দিয়ে। পরদিন সূর্যোদয়ের বহু পরে আস্তে আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে

এসে দৈনন্দিন কাজ-কর্ম শুরু করত লোকেরা। রাতের বেলা পায়খানা প্রস্রাবের কাজও ঘরের ভেতরই সারতে হত তাদের। কে যাবে শুধু শুধু বাইরে বেরিয়ে চিতার হাতে জান দিতে? তারচেয়ে একটু দুর্গন্ধ সহ্য করা বরং অনেক ভাল।

লোকেরা সতর্ক হয়ে যাওয়ায় শিকার ধরা অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়ে পড়ল চিতাটার পক্ষে। কাজেই আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল সে। এরপর দুই দুই বার লতাপাতার বেড়া ফাঁক করে ঘরে ঢুকে মানুষ ধরে নিয়ে গেল চিতাটা। দু'জন হতভাগ্য লোকের আর্তচিৎকার ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। দরজা-বন্ধ ঘরে বসে সেই চিৎকার শুনতে শুনতে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকল তাদের প্রতিবেশীরা। আর একবার কঞ্চির শক্ত বেড়া ভেদ করতে না পেরে ঘরের চালে উঠে আঁচড়ে আঁচড়ে খড়ের চাল ফাঁক করে সেই পথে ঘরে প্রবেশ করে চিতাটা। ঘরের মালিককে খুন করে সেই পথেই শিকার নিয়ে বেরোতে গিয়ে দেখে ওখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না সে। নিজের ব্যর্থতায় প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে একে একে খুন করে চিতাটা হতভাগ্য লোকটির বউ আর দুটো বাচ্চাকে। তারপর চারজনের লাশ সেই ঘরে ফেলে রেখেই যে পথে প্রবেশ করেছিল সেই পথে ফিরে যায় সে।

দিনের বেলায়ও গ্রাম ছেড়ে কোথাও যেতে হলে দা কুঠার-বর্শা ইত্যাদি হাতিয়ার নিয়ে দল বেঁধে বেরোত ওই

এলাকার লোকেরা। যদিও দিনের বেলা কখনও আক্রমণ করত না চিতাটা।

এমনি যখন অবস্থা, তখন একদিন কেনেথ এনডারসনকে চিঠি লিখে চিতাটার কথা জানালেন ওখানকার তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট জেপসন, সেই সাথে চিতাটাকে মারার অনুরোধও জানালেন তিনি।

জেপসনের চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে গুম্মালাপুরে এসে হাজির হলেন কেনেথ এনডারসন। এসে শুনলেন, চিতাটাকে কোন চতুষ্পদ জন্তু বলে মনে করে না ওখানকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা। তাদের ধারণা, ওটা কোন পিশাচ আত্মা, মানুষের রক্ত মাংস ছাড়া যাদের চলে না। সুতরাং গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা বাদ দিলেন এনডারসন।

সেই রাতে গ্রামের ঠিক মাঝখানে এক বাড়ির উঠোনে চেয়ারে বসে চিতাটার অপেক্ষা করার পরিকল্পনা করলেন এনডারসন। তাঁর পেছনে একটা ঘর। বার ফুট উঁচু বাঁশের কঞ্চির বেড়া দেয়া ঘরের খড়ের চালে দিনের বেলায়ই কাঁটা-লতা বিছিয়ে দিলেন তিনি। উদ্দেশ্য, চিতাটা যদি ঘরের চালে উঠে পেছন থেকে তাঁর উপর লাফিয়ে নামার পরিকল্পনা করে তাহলে কাঁটালতার জন্যে তা সে পারবে না। কোন অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত যদি উঠে পড়েও, শুকনো লতাপাতায় চিতাটার পা পড়ে শব্দ হবেই এবং ওটার অস্তিত্ব জাহির হয়ে পড়বে তাঁর কাছে।

ছ'টা বাজতে না বাজতেই সেদিন যার যার ঘরে ঢুকে

দরজা বন্ধ করে দিল গ্রামের লোকেরা। গুলি ভরা রাইফেলটা নিয়ে চেয়ারে এসে বসলেন এনডারসন। হয়তো সারাটা রাতই বসে বসে পাহারা দিতে হবে তাঁকে। তাই সঙ্গে রেখেছেন গরম চা ভর্তি ফ্লাস্ক, কিছু বিস্কুট, একটা কম্বল একটা টর্চ, পানি ভর্তি বোতল, পাইপ, তামাক এবং দিয়াশলাই।

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল উত্তেজনাকর মুহূর্ত-গুলো। তারাগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে কিছুটা দেরি হবে, সুতরাং এই সময়টুকুতে আবছা আলো পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। সূর্য ডোবার পরও সাধারণতঃ কয়েক মিনিট কিছু আলো থাকে, কিন্তু এখানে, গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে লম্বালম্বি ভাবে পড়ে থাকা দুটো পাহাড়ের জন্যে সে-আলোও পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ, গ্রামের ওপর ছায়া ফেলেছে পাহাড় দুটো।

শক্ত করে দু'হাতে রাইফেল চেপে ধরে অন্ধকারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন এনডারসন। আশপাশের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে নানা জন্তুজানোয়ার ও পাখীর ডাক। এই মুহূর্তে মনে মনে ওদেরকে ধন্যবাদ দিলেন তিনি, কারণ চিতাটা এলে তাকে হুঁশিয়ার করে দেবে ওরাই। অন্ধকারে নিথর পড়ে আছে সমস্ত গ্রামটা, লোকজনের সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না একটা ঘর থেকেও। যেন কোন মানুষ নেই এই গ্রামে, থাকেই না।

সময় বয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তারারা

আলো। সোয়া সাতটার দিকে পুরোপুরি উজ্জ্বল হয়ে ওঠা তারার আলোয় গাঁয়ের রাস্তাগুলো আবছাভাবে চোখে পড়তে লাগল এনডারসনের। ক্রমশঃ নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে এল তাঁর। কোনভাবে চিতাটার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করানো যায় কিনা ভাবতে লাগলেন তিনি। ইচ্ছে করেই জোরে জোরে কাশতে শুরু করলেন। বার কয়েক কেশে নিয়ে দু'জন মানুষের কথা বলার মত করে কথা বলতে লাগলেন নিজে নিজেই। আশা, মানুষের কথার আওয়াজ শুনে যদি অনুসন্ধান করতে এগিয়ে আসে চিতাটা।

পাঠকদের মধ্যে কেউ নিজের সাথে নিজেই কথোপকথন চালাবার চেষ্টা করে দেখেছেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি দেখেছি। সাংঘাতিক কষ্ট হয় তাতে। কাজেই কেনেথ এনডারসনের কষ্টটাও এ থেকেই অনুমান করা যায়। এনডারসনকে নিজে নিজে কথা বলতে শুনে গাঁয়ের লোক প্রথমে অবাক হয়েছিল, তারপর ভেবেছিল, অশুভ আত্মা এসে চড়াও হওয়ায় পাগল হয়ে গেছেন বিদেশী শিকারী। পরদিন কথাটা জানিয়েছিল তারা এনডারসনকে।

একটানা নিজের সাথে কথা বলে আর একই সময়ে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে রাখতে ন'টার দিকে ক্লান্ত এবং বিরক্ত বোধ করতে লাগলেন এনডারসন। গ্রামের পথে পথে এক চক্কর ঘুরে আসার কথাটা এ সময়েই মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠল তাঁর মনে। কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগতে ভুগতে শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন

তিনি। আবার নিজের সাথে কথা বলতে বলতে, মাঝে মাঝেই দু'পাশে আর পেছনে চাইতে চাইতে নেমে এলেন পথে। একটু পরই টের পেলেন, এভাবে পথে বেরিয়ে আসাটা সাংঘাতিক বোকামী হয়ে গেছে। যে কোন মুহূর্তে, যে কোন ঘরের কোণের ছায়া থেকে, ঘরের চাল কিংবা রাস্তার পাশের ছোট ছোট ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে চিতাটা। সঙ্গে সঙ্গে কথা বলা থামিয়ে দিয়ে ফিরে চললেন তিনি। নিরাপদে আবার আগের চেয়ারটায় ফিরে আসতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

অতি ধীরে গড়িয়ে চলেছে সময়ের চাকা, যেন লক্ষ লক্ষ টন ওজনের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে কেউ সেই চাকার ওপর। এভাবেই মাঝ রাত হল। নতুন বিপদ দেখা দিল এই সময়। উত্তর থেকে বয়ে আসা বাতাসে ভর করে এল তীব্র ঠাণ্ডা, হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয় তা। গায়ের ওপর কম্বলটা ভাল মত জড়িয়ে নিয়ে পাইপ ধরালেন এনডারসন। রাত দুটোর দিকে ঘুম ঘুম ভাব এসে গেল তাঁর। প্রথমে বোতল খুলে ঠাণ্ডা পানির ছিটে দিলেন চোখে মুখে, তারপর চা আর বিস্কুট খেয়ে দূর করলেন ঘুমের ভাবটা। এই সময়ে আবার কথা বলতে শুরু করলেন নিজের সাথে, ঘুমটাও দূরে থাকবে তাতে।

সাড়ে তিনটার পর থেকে পরবর্তী দু'ঘণ্টা চরম অস্বস্তির ভেতর কাটল এনডারসনের। হঠাৎ করেই গাঢ় কুয়াশায় ঢেকে গেল আশপাশ। তারাগুলোকেও পুরোপুরি ঢেকে দিল

সে কুয়াশা। নিকষ কালো অন্ধকারে ছেয়ে গেলে প্রকৃতি। গজখানেক দূরের জিনিসের অবয়বও আর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এই সময়ে যদি আসে চিতাটা, দেখতে পাবেন না এনডারসন। অর্থাৎ পুরোপুরি মানুষখেকোটার দয়ার ওপর এখন নির্ভর করছে তাঁর জীবন।

প্রতি আধ মিনিট পর পর টর্চ জ্বেলে চারপাশটা দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন এনডারসন। কিন্তু টর্চের আলোও সে-কুয়াশার কয়েক গজের বেশি ভেদ করতে পারছে না। বার বার আলো দেখে হয়তো এদিকে আসতে চাইবে না চিতাটা। এ রাতে ওটাকে মারার আশাও নেই, কিন্তু তবু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই এনডারসনের। অবশ্য একটা সূক্ষ্ম আশা আছে তাঁর মনে, আলো দেখে হয়তো ভয় পাবে না বেপরোয়া চিতাটা। বরং কারণ অনুসন্ধানের জন্যে কৌতূহল বশতঃ আরও এগিয়ে আসবে কাছে। কিন্তু এলো না চিতাটা। ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত টর্চ জ্বালানো নেভানোর কাজ চালিয়েই গেলেন এনডারসন।

দুপুরের আগে পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলেন এনডারসন। তারপর প্রয়োজনীয় খোঁজ খবরের আশায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন গ্রামের লোকদের। সকাল বেলা এনডারসনকে বহাল তবিয়তেই থাকতে দেখে দারুণ অবাক হয়ে গিয়েছিল তারা। সোজা ভেবে বসল, যাদু জানেন এনডারসন এবং এই যাদুর জোরেই চিতাটাকে কাছে ঘেঁষতে

দেননি তিনি। গাঁয়ের লোকের এ কথা ভাবার কারণও অবশ্য ছিল। এনডারসনকে আগের রাতে মাঝে মাঝেই নিজে নিজে কথা বলতে শুনেছে তারা এবং এটাকে ভেবেছে চিতা তাড়ানোর মন্ত্র। এতে সুবিধেই হল এনডারসনের। তিনি কাছাকাছি থাকলে চিতা নামক পিশাচ আত্মাটা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না এটা বুঝে নিয়ে মুখ খুলল গাঁয়ের লোকে। তাদের কাছে জানা গেল, যেখানে সেখানে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ায় চিতাটা, সুযোগ পেলেই মানুষ খুন করে। গত তিন সপ্তাহ ধরে গুম্মালাপুরে মানুষ মারেনি চিতাটা, তবে তার আশপাশের গাঁয়ে মেরেছে। সুতরাং এনডারসন ধরে নিলেন, শীঘ্রই এ অঞ্চলে এসে হানা দেবে ওটা। আরও জানা গেল, দিনের বেলায় কখনও মানুষ মারেনি বা মারার চেষ্টা করেনি চিতাটা। তাই দিনের বেলা জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে ওটার সাক্ষাৎ পাওয়ার আশা নেই বললেই চলে। জানোয়ারটার ডান থাবাটাও নাকি খোঁড়া। পরে অবশ্য কথাটা সত্যি বলেই প্রমাণিত হয়েছিল এনডারসনের কাছে।

দুপুরের খাওয়ার পর রাতের জন্যে নতুন পরিকল্পনা করায় মন দিলেন এনডারসন। গত রাতে যে যে ভুল করেছেন তা আর করতে যাচ্ছেন না তিনি। নতুন পরিকল্পনা মতে, একটা ঘরের খোলা দরজার কাছে একটা মানুষ প্রমাণ খড়ের পুতুলকে গেঁয়ো লোকের পোশাক পরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। সেই ঘরেরই এক কোণে রাই-

ফেল হাতে তৈরি হয়ে আড়ি পেতে বসে থাকবেন এনডারসন। তাঁর সামনে ব্যারিকেডের মত করে রেখে দেয়া হবে কয়েকটা কাঠের বাক্স। খোলা দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখা পুতুলকে সত্যিকার মানুষ মনে করে আক্রমণ করে বসতে পারে চিতাটা—সে সম্ভাবনাই বেশি, এবং তাহলে চিতাটাকে গুলি করার একটা সুযোগ পেয়েও যেতে পারেন এনডারসন।

গাঁয়ের লোকেদের কাছে তাঁর পরিকল্পনার কথা খুলে বললেন এনডারসন। ভেবেছিলেন খুব একটা গুরুত্ব দেবে না, কিন্তু তাঁকে অবাক করে দিয়ে সহজেই রাজী হয়ে গেল তারা। একটা ঘর এনডারসনের কাজের জন্যে খালি করে দিল তারা। এ ঘরটার একেবারে পাশের ঘরেরই খড়ের চাল ফাঁক করে ঘরে ঢুকে কিছুদিন আগে চার চারটে মানুষকে খুন করে ফেলে রেখে যায় চিতাটা। খড় এবং পুরানো ছেঁড়া বালিশের তুলো দিয়ে একটা সুন্দর পুতুল তৈরি করে ফেলা হল। ওটার গায়ে পরিয়ে দেয়া হল পুরানো ব্লাউজ এবং শাড়ী। তারপর মাঝারি আকারের ঘোমটা টেনে দিয়ে খোলা দরজায় পেছন ফিরে দাঁড় করিয়ে রাখার পর বোঝাই গেল না ওটা সত্যিকার মানুষ নয়, পুতুল। ঘরের মেঝেটা দৈর্ঘ্যে বার এবং প্রস্থে ফুট দশেক হবে। কাজেই দরজার উল্টো দিকের যে কোন কোণ থেকেই পুতুলটার দূরত্ব অত্যন্ত কম। চিতাটা ওটাকে আক্রমণ করলে এত কাছ থেকে কিছুতেই মিস করবেন না

এনডারসন। যদি বুঝে ফেলে চিতাটা, পুতুল সাজিয়ে ফাঁকি দেয়া হচ্ছে তাকে, আসল লোক রয়েছে ঘরের ভেতরে, তাহলে বেড়া বা চাল ফাঁক করে ঢোকার চেষ্টা করবে ওটা, সেক্ষেত্রেও ওটাকে ঠেকাবার মত যথেষ্ট সময় পাবেন তিনি। চিতাটাকে ফাঁকি দেবার পরিকল্পনা আরও নিখুঁত করার জন্যে আশপাশের দু'একটা ঘরের মেয়েলোকদের রাতের বেলায় উঁচু গলায় কথা বলার নির্দেশ দিলেন এনডারসন। এতে আরও একটা কাজ হবে, কাছে পিঠে থেকে থাকলে মানুষের গলার শব্দ শুনে তা অনুসন্ধান করতে আসবেই চিতাটা।

কিন্তু কথা বলতে রাজী হতে চাইল না মেয়েরা। তাদের ভয়, যে ঘর থেকে কথার আওয়াজ আসবে সে-ঘরেই ঢুকতে চাইবে চিতাটা। বাধ্য হয়ে মেয়েদের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন এনডারসন, তাদের কাছ থেকে তেমন কোন বিপদ সংকেত পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যাবেন তিনি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এনডারসনের কথায় রাজী হয়ে গেল মেয়েরা।

সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ এনডারসনের পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কাজ শেষ হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই পুতুল রাখা ঘরটা ছাড়া নিয়ম মাফিক গ্রামের বাকি সমস্ত ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তৈরি হয়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে বসলেন এনডারসন। সাঁঝ গড়িয়ে রাত হল। তারার আলোয় আবছাভাবে পুতুলটার অবয়ব চোখে পড়ছে তাঁর। একটু

পর পরই পাশের দুটো ঘর থেকে মেয়েদের নিচু গলায় কথা বলার আওয়াজ ভেসে আসছে কানে।

অতি ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে বিরক্তিকর একঘেয়ে প্রহরগুলো। একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন এনডারসন, হঠাৎ ঘরের চালে একটা মৃদু খস খস শব্দ শুনে চমকে উঠলেন। অত্যন্ত উত্তেজনার মাঝে কাটল দুটো সেকেণ্ড। তারপরই ব্যাপারটার কারণ বুঝতে পেরে হেসে ফেললেন মনে মনে। ঘরের চালের নিচের বাঁশের মাচান থেকে শব্দ করে লাফিয়ে মাটিতে পড়ল একটা বিশাল ইঁদুর। মেঝেতে পড়েই ঘরের দরজার দিকে ছুটে গেল ইঁদুরটা। দরজার কাঠের ফ্রেমের ওপর দিয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া ইঁদুরটার আবছা অবয়ব চোখে পড়ল এনডারসনের। পরিষ্কার বুঝতে পারলেন তিনি ইঁদুরটাকে ফাঁকি দিতে পারেনি খড়ের পুতুল। মনটা দমে গেল তাঁর। ইঁদুরটা যখন বুঝে ফেলতে পেরেছে ওটা সত্যিকার মানুষ নয়, তখন চিতার মত ধুরন্ধর প্রাণীই বা পারবে না কেন?

বৈচিত্র্যশূন্যতার ভেতর দিয়েই পেরিয়ে গেল মাঝরাত। দুপাশের ঘর দুটো থেকে এখন আর মেয়েদের কথা শোনা যাচ্ছে না, বোধহয় বক বক করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বার বার তন্দ্রা এসে যাচ্ছে এনডারসনেরও, কিন্তু জোর করে জেগে থাকার চেষ্টা করছেন তিনি। মাঝে মাঝেই ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে খাচ্ছেন, একনাগাড়ে পাইপ

টেনে চলেছেন, তবু দূরে থাকতে চাইছে না ঘুম। ওদিকে বিরামশূন্য ভাবে ঘরের চাল আর মেঝেতে দাপাদাপি করে চলেছে ইঁদুরের দল। এই গণ্ডগোলের মধ্যে চিতাটা এলেও তার আগমন সংবাদ টের পাবেন না এনডারসন। কিন্তু এ রাতেও এল না চিতাটা। আর একটা ব্যর্থ রাত কাটিয়ে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লেন এনডারসন।

আগের দিনের মতই দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠে আর একটু ভাল পরিকল্পনার কাজে মন দিলেন এনডারসন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আগামী দু'একদিনের মধ্যে আসবেই চিতাটা। গত রাতের মতই এরাতেও আবার পুতুলের ফাঁদ পেতে বসা স্থির করলেন তিনি।

আগের দিনের মতই সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ গিয়ে ঘরের কোণে বসলেন এনডারসন। রাতের প্রথম অংশটা গত রাতেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল। ইঁদুরের দাপাদাপি, পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা নারীকণ্ঠ ইত্যাদি ভেঙে দিচ্ছে রাতের অখণ্ড নীরবতা। রাত একটার পর থেকে হঠাৎ করেই জোর বাতাস বইতে শুরু করল। ঘরের খড়ের চালে ঝাপটা মেরে রহস্যজনক মৃদু সড়সড়ে আওয়াজ তুলছে সে হাওয়া। ক্রমেই বাড়ছে বাতাসের বেগ, ধীরে ধীরে ঝড়ো হাওয়ায় রূপ নিল তা। মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল সারা আকাশ। তারাগুলো ঢাকা পড়ে গেল সেই মেঘের আড়ালে। তারার আলো ঢাকা পড়ে যাওয়ায় আবছাভাবেও আর দেখা যাচ্ছে না পুতুলটা। এক ফোঁটা দু'ফোঁটা করে পড়তে পড়তে মুষল-

ধারে বৃষ্টি নামল এক সময়। অতএব এরাতেও চিতাটার দেখা পাওয়ার আশা বাদ দিলেন এনডারসন। কারণ, বিড়াল গোষ্ঠির প্রত্যেক প্রাণীই পানিকে এড়িয়ে চলে। তার ওপর এই ঝড় বাদলার রাতে তো কিছুতেই গুহার উষ্ণ আশ্রয় ছেড়ে বেরোতে চাইবে না চিতাটা।

পাশের ঘর থেকে নারীকণ্ঠও আর শোনা যাচ্ছে না। হয় কথা বলা বন্ধ করে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েরা, নয়তো বৃষ্টির জোর আওয়াজে ঢাকা পড়ে গেছে তা। তীক্ষ্ণ চোখে দরজার দিকে চেয়ে থাকলেন এনডারসন, কিন্তু নিকষ কালো অন্ধকারে পুতুল তো দূরের কথা দরজা-টাই ঠাহর করা যাচ্ছে না ভালমত। একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা হয়ে গেল তাঁর, ঘুমও পাচ্ছে। চিতাটার আসার সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে। অতএব পেছনের বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমিয়েই পড়লেন তিনি একসময়।

কতক্ষণ ঠিক বলতে পারবেন না, তবে বোধহয় বেশ অনেকক্ষণ পরই আচমকা কেন যেন জেগে উঠলেন তিনি। ঘুম ভাঙতেই তাঁর মনে হল কিছু একটা অস্বাভাবিকতা বিরাজ করছে চারপাশের আবহাওয়ায়, কিন্তু ঠিক কি তা বলতে পারবেন না। অন্য কোন সাধারণ লোক হলে এভাবে হঠাৎ ঘুম ভাঙার পর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঠাহর করতে বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় নিত, কিন্তু এনডারসনের তা লাগলো না। কারণ, দীর্ঘ দিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে আর

মানুষখেকো শিকার করে করে বিপদ সম্পর্কে একটা অদ্ভুত সচেতনতাবোধ এসে গেছে তাঁর ভেতরে। তাই জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কি অবস্থায় আছেন মনে পড়ে গেল এনডারসনের। পরমুহূর্তে ঘুম ভাঙার কারণ আন্দাজ করতে চেষ্টা করলেন তিনি।

বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশও পরিষ্কার হয়ে এসেছে কিছুটা। দরজার দিকে চেয়ে দেখলেন এনডারসন, অত্যন্ত আবছাভাবে হলেও দেখা যাচ্ছে পুতুলটাকে। আরও দুই-মুহূর্ত পর ঘটল অবাক কাণ্ডটা। চোখের সামনে দেখতে পেলেন এনডারসন, একটু যেন নড়ে উঠল পুতুলটা, তার পরেই ভারী কিছুর ধাক্কায় গড়িয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটা চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন। পরিষ্কার বুঝলেন এনডারসন ব্যাপারটা। বৃষ্টি থামার পর পরই এসেছে চিতাটা, কয়েক মিনিট দরজার কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে থেকেছে, তারপর সুযোগ বুঝে এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পুতুলটার ওপর। পরক্ষণেই পুতুলটাকে চিনতে পেরে ক্ষেপে গিয়ে গর্জন করে উঠেছে। মুহূর্তের জন্যে দরজায় দাঁড়ানো চিতাটার আবছা অবয়ব নজরে এল এনডারসনের, পরক্ষণেই হারিয়ে গেল ওটা বাইরের অন্ধকারে।

একলাফে উঠে দাঁড়ালেন এনডারসন। রাইফেলের নলে বাঁধা টর্চের সুইচটা টিপে দিয়েই বাক্সের ব্যারিকেড ডিঙিয়ে ছুটলেন খোলা দরজার দিকে। দরজার কাছে

পড়ে থাকা পুতুলটার গায়ে হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়তে পড়তে এসে দাঁড়ালেন বৃষ্টিভেজা পিচ্ছিল উঠোনে। সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে টর্চের আলোয় ভালমত দেখে নিলেন একবার উঠোনের চারদিক। তাঁর ধারণা, আশপাশেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে চিতাটা। দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ঘর দুটোর অন্ধকার কোণগুলোয় টর্চের আলো ফেলে দেখতে দেখতে সাবধানী পায়ে উঠোন পেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন তিনি রাস্তার ওপর। কয়েক গজ এগিয়েই বাঁয়ে তীক্ষ্ণ মোড় নিয়েছে রাস্তার ডান মাথাটা, মোড়ের ভেতরের দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘর। ঘরের ওপাশেই চিতাটা ঘাপটি মেরে আছে বলে মনে হল এনডারসনের। রাইফেলটা সামনে বাগিয়ে ধরে অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে চললেন তিনি। দুরু দুরু কাঁপছে বুক। যে-কোন মুহূর্তে তাঁকে আক্রমণ করে বসতে পারে চিতাটা। যদিও মাত্র কয়েক গজ পথ পেরোতে হয়েছে, তবু মোড়টার কাছে পৌঁছুতে কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে বলে মনে মনে হল এনডারসনের। কিন্তু মোড়ের কাছে পৌঁছে দেখতে পেলেন না তিনি চিতাটাকে। সেখানেই দাঁড়িয়ে আশপাশের ঘরগুলোর অন্ধকার কোণ, খড়ের নিচু চাল এবং রাস্তার পাশে লুকিয়ে থাকার সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় আলো ফেলে ফেলে পরীক্ষা করে দেখলেন এনডারসন, কিন্তু চিতাটা নজরে পড়ল না তাঁর। আশপাশে কোথাও নেই ওটা।

এই সময়েই প্রশ্নটা মনে জাগল এনডারসনের। একটু আগে বিপদ টের পেয়ে চিতাটাকেও হুঁশিয়ার করে দেয়নি তো ওটার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়? বহুবার জঙ্গলের অধিবাসী লোকেদের মুখে শুনেছেন, এর আগে নিজেও দু'একবার চিতার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েছেন এনডারসন। এই জানোয়ারটাও বিড়াল গোষ্ঠির আশ্চর্য ধূর্ততম ওই প্রাণীদেরই একটি, তার ওপর এটা আবার মানুষখেকো, সাধারণের চাইতে আরও একধাপ ওপরে। কাজেই, এনডারসনকে দেখেই যে তিনি আর সব মানুষের মত সাধারণ নন, এটা বুঝতে পেরে পালায়নি চিতাটা তা কে বলতে পারে? অবশ্য এটাও হতে পারে, আচমকা টর্চের উজ্জ্বল আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় হকচকিয়ে গিয়ে পালিয়েছে চিতাটা। এরপর বাকি রাতটা গুম্মালাপুরের পথে পথে চিতাটার খোঁজে ঘুরে বেড়ালেন এনডারসন, কিন্তু কোথাও জানোয়ারটার চিহ্নমাত্র চোখে পড়ল না তাঁর। যেন হাওয়ায় উবে গেছে ওটা। প্রয়োজনের মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে নিজেকে গাল-মন্দ করতে করতে আস্তানায় ফিরে এলেন এনডারসন।

পরদিন সকালে চিতাটার খোঁজে আবার বেরিয়ে পড়লেন এনডারসন। গাঁয়ে ঢোকার পথের ওপর চিতার টাটকা পায়ের চিহ্ন চোখে পড়ল তাঁর। একটু এগিয়েই একটা সরু কাদাভর্তি নালা পেরিয়ে কিছুদূর চলে আবার ঘুরে এসে গাঁয়ে ঢুকেছে চিতাটা। নরম কাদার ওপর গভীর

ভাবে বসে যাওয়া পায়ের ছাপগুলো পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন এনডারসন, চিতাটার সামনের ডান পা-টায় গণ্ডগোল আছে। কারণ এ পায়ের ছা'পটা অন্য তিনটে পায়ের চাইতে অস্পষ্ট এবং একটু তেরছাভাবে পড়েছে কাদার ওপর। যেভাবেই হোক পা'টায় চোট পেয়েছিল চিতাটা, তার মানুষখেকোতে পরিণত হবার কারণও বোধহয় এটাই। ছাপ ধরে ধরে এগিয়ে চললেন এনডারসন। একটু ভেতরে ঢুকেই আবার কি মনে করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বড় রাস্তা ধরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে গিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে চিতাটা। বনের ভেতরের পাথুরে মাটিতে এসে হারিয়ে গেল তার পায়ের ছাপ। ভাবনায় পড়ে গেলেন এনডারসন। ছাপ দেখে বোঝা যায় গাঁয়ের বেশি ভেতরে প্রবেশ করেনি চিতাটা, তাহলে গত রাতে তাঁর ঘরের কাছে পৌঁছেছিল কি করে ওটা? উড়ে আসেনি নিশ্চয়ই? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর কথাটা। গত রাতে তাঁর ঘরে এসে পুতুলটাকে আক্রমণ করার পর ফিরে গিয়েছিল চিতাটা। এরপর আবার বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে মুছে যায় তার পায়ের ছাপ। বৃষ্টি থামার পর দ্বিতীয়বার গ্রামে প্রবেশ করেছিল চিতাটা। কিছুদূর এসেই ভোর হয়ে যাচ্ছে দেখে ফিরে যায় আবার। অথবা জানোয়ারটার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল এনডারসনের টর্চের আলো, কারণ এর আগে কখনও এ ধরনের আলো দেখেনি ওটা। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে বেশ কিছুদিন আর

এদিকে আসবে না চিতাটা। পুতুলের ফাঁদের ব্যাপারটাও জানা হয়ে গেছে তার, কাজেই ওভাবেও আর কাছে আনা যাবে না তাকে। অতএব কৌশল বদলাতে হবে।

বহু চিন্তাভাবনা করে দেভারাবেট্টা গ্রামে তাঁর আস্তানা সরিয়ে নেয়া স্থির করলেন এনডারসন। গুম্মালাপুর থেকে আঠার মাইল জঙ্গল আর পাহাড়ী পথ পেরিয়ে যেতে হয় এই গ্রামে। মোট পাঁচজন লোক খুন করার পর গত একমাস ধরে ওই গাঁয়ে আর হামলা চালায়নি চিতাটা। কাজেই ওখানে আবার তার হানা দেয়ার সময় হয়ে এসেছে।

সকাল এগারটার দিকে তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিয়ে দেভারাবেট্টার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন এনডারসন। পথ চলা অত্যন্ত কষ্টকর। উঁচু নিচু এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ী পথ ধরে চলতে হচ্ছে তাঁকে। বেশ খানিকক্ষণ চলার পর একটা পাহাড় পেরিয়ে এলেন তিনি। পাহাড়টার ওপারের উপত্যকার নিচ দিয়ে বয়ে গেছে একটা নালা। নালার ধার বরাবর চলতে চলতে এক জায়গায় নালার বুকের নরম মাটিতে বাঘের পায়ের ছাপ চোখে পড়ল তাঁর। নরম মাটিতে বসে যাওয়া পায়ের ছাপের ছোট ছোট গর্তগুলোতে জমা হয়েছিল রাতের বৃষ্টির পানি, সূর্যের তাপে তা তখনও বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে পারেনি। এর ওপর রোদ পড়ে ঝিকমিক করে জ্বলছে, মাঝে মাঝে সৃষ্টি করছে রামধনুর সাত রং। কাছে থেকে কিছু না, কিন্তু চোখ তুলে সামনে তাকালে দেখা যাবে, দশ পনের গজ দূর থেকে সোনালী

বালির পটভূমিকায় লম্বালম্বি ভাবে চলে যাওয়া পানি ভর্তি পায়ের ছাপগুলোর ওপর সূর্যের আলো পড়ে এক অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। শ'দুয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে নালার ওপারের জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে বাঘটা। অন্য সময় হলে হয়তো অনুসরণ করে করে বাঘটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন এনডারসন, কিন্তু হাতে জরুরী কাজ থাকায় এখন তা সম্ভব হল না। পাহাড়-জঙ্গল-নালা পেরিয়ে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বিকেল পাঁচটা নাগাদ দেভারাবেট্টায় এসে পৌঁছুলেন তিনি।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার জোগাড় করছে তখন দেভারাবেট্টার লোকেরা। এনডারসনকে আসতে দেখে উঁকিঝুঁকি মেরে তাঁকে দেখলো বটে, কিন্তু ঘর থেকে বেরোল না তারা। অগত্যা দু'একটা ঘরে ঢুকে কয়েকজন লোকের সাথে কথা বলে চিতাটা সম্পর্কে নতুন কিছু জানা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখলেন এনডারসন। তারা জানাল, এখন থেকে যে কোন দিন এ গাঁয়ে এসে হানা দিতে পারে মানুষখেকোটা, কারণ তার আসার সময় আরও দশ দিন আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। গত এক মাসে এখানে কোন মানুষ মারেনি চিতাটা। এর আগে এক জায়গায় এত দীর্ঘ দিন ধরে অনুপস্থিত থাকেনি কখনও।

হাতে সময় কম। রাতের মত চিতাটার অপেক্ষায় কোথায় বসা যায় একপাক ঘুরে দ্রুত খুঁজে নিতে চললেন এনডারসন। গুম্মালাপুরের চেয়ে ছোট এবং জঙ্গলের একেবারে

লাগোয়া দেভারাবেট্টা গ্রামটা। এতে খুশিই হলেন এনডারসন, কারণ জঙ্গলের সাবধানী জন্তু জানোয়ারেরা মানুষখেকোটার গতিবিধির খবর আগে ভাগেই জানিয়ে দিতে পারবে তাঁকে। খুঁজে পেতে আর কিছু না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষখেকোটার অপেক্ষায় গুম্মালাপুরে যে ভাবে মাটিতে বসে রাত কাটিয়েছিলেন এনডারসন, এখানেও সেভাবেই বসার সিদ্ধান্ত নিলেন। অনেক বলে কয়ে আর অভয় দিয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে একজন লোককে রাজী করালেন তিনি। দু'জনে মিলে গাঁয়ের পাশের জঙ্গল থেকে কাঁটাঝোপ আর লতাপাতা কেটে এনে ভালমত বিছিয়ে দিল একটা খড়ো ঘরের চালে। ঘরের চালে উঠে এসে পেছন থেকে যেন এনডারসনকে আক্রমণ করতে না পারে চিতাটা তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। কাজ শেষ হলে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা, আর চালে কাঁটা বিছান ঘরটার দিকে পেছন করে ঘরের একদিকের বেড়ার একেবারে গা ঘেঁষে জঙ্গল-মুখো হয়ে চিতাটার অপেক্ষায় বসলেন এনডারসন।

আশ্চর্য দ্রুত গতিতে নামল রাত। শুক্ল পক্ষের সরু একফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে। উঁচু গাছের ডালে বসে ক্বচিত কর্কশ গলায় ডেকে উঠছে এক আধটা বনমোরগ। মাঝে মধ্যে বিলাপ করে উঠছে বনময়ূরী, পর মুহূর্তেই দূরের ঝোপ থেকে তার ডাকের উত্তর দিচ্ছে ময়ূর। এদের ডাকাডাকির ধরন শুনেই বুঝতে পারছেন এনডারসন, বিপদ

নেই আশপাশে। আকাশ জুড়ে চলছে তারার মেলা। ওই তারা আর নতুন চাঁদের আলো থাকায় অন্ধকার জমাট বাঁধতে পারছে না ঠিকই, তবে পুরোপুরি দূরও হচ্ছে না। কেমন একরকম আবছা ভৌতিক আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। গাঁয়ের বুক চিরে চলে যাওয়া রাস্তাটাকে আবছা-মত ঠাহর করতে পারছেন এনডারসন।

ধ্ব-ং-ক! ধ্ব-ং-ক! ভারি ঘণ্টার মত আওয়াজ করে বনের ভেতর থেকে ডেকে উঠল একটা শম্বর হরিণী। কয়েক মুহূর্ত একভাবে ডেকে গলার স্বর পালটে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে চলল, অর্থাৎ বিপদ দেখতে পেয়েছে ওটা। নিঃসন্দেহে কোন মাংশাসী নিশাচর পশু ঘুরে বেড়াচ্ছে আশপাশে এবং চোখে পড়ে গেছে সদাসতর্ক হরিণীর। সঙ্গে সঙ্গে তার সমগোত্রীয় এবং জঙ্গলের অন্যান্য নিরীহ প্রাণীকুলকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে সে। কিন্তু কোন্ মাংশাসী জানোয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে ওখানে? সাধারণ বাঘ, চিতা, না মানুষখেকোটা? সে যাই হোক, জঙ্গলের অন্যান্য প্রাণীদের মত সতর্ক হয়ে গেলেন এনডারসনও। ঘড়িতে দেখলেন সাড়ে আটটা বাজে।

চেঁচানো থামিয়ে দিয়েছে শম্বরটা। আরও পনের মিনিট পর, যেদিক থেকে ডেকে উঠেছিল হরিণীটা সেদিক থেকেই শোনা গেল বাঘের গর্জন। পর পর দু'বার ডেকে উঠেই থেমে গেল বাঘটা। শুনেই বোঝা গেল, খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে ডাকাডাকি করছে ভারতীয় জঙ্গলের সম্রাট। এই

মুহূর্তে তার সামনে যে জানোয়ারই পড়ুক না কেন, প্রাণ দিতে হবে তাকে, এটা নিশ্চিত।

গড়িয়ে চলল সময়। হঠাৎ রাস্তাটার শেষ মাথায় কোন জানোয়ারের নড়াচড়া দৃষ্টি আকর্ষণ করল এনডারসনের। আস্তে করে রাইফেল তুলে বাঁটটা কাঁধে ঠেকিয়ে ওটার দিকে লক্ষ্যস্থির করে অপেক্ষা করতে থাকলেন তিনি। ধীরে ধীরে রাস্তার মাঝামাঝি চলে এল জানোয়ারটা। ওটা আদৌ কোন চিতা কিনা সন্দেহ হল এনডারসনের। কারণ নিজেকে আড়াল করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করছে না জানোয়ারটা। শিকার ধরার আগে তো বটেই, এমনি সময়েও নিজেকে বেশ রেখে ঢেকে সতর্ক হয়ে চলাই চিতার স্বভাব। এগিয়েই আসছে জানোয়ারটা। পঁয়ত্রিশ, ত্রিশ, পঁচিশ, বিশ গজ দূরে থাকতেই রাইফেলের নলে বাঁধা টর্চের সুইচ টিপলেন এনডারসন।

জোরালো টর্চের আলো গায়ে এসে পড়তেই থমকে দাঁড়াল জানোয়ারটা। আলোর উৎসের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ মিট মিট করতে থাকল। মৃদু হাসলেন এনডারসন। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা নেড়ি কুত্তা। ক্ষুধার্ত, হাড় জিরজিরে শরীর। বোধহয় সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। আর পড়বেই বা কোথা থেকে? যে দেশে অধিকাংশ মানুষের পেটই খালি থাকে, সে-দেশে একটা নেড়ি কুত্তার পেট ভরাবে কে? আলোটা চোখে সয়ে যেতেই ধীরে ধীরে লেজ নাড়াতে শুরু করল কুকুরটা। বুঝতে পেরেছে ওই

আলোর স্রষ্টা মানুষ, কাজেই সঙ্গ চাইছে সে, বন্ধু হতে চাইছে।

সঙ্গী পেয়ে খুশি হলেন এনডারসনও, ওই ক্ষুধার্ত একাকী কুকুরটার জন্যে একটু মায়াও অনুভব করলেন মনে মনে। টর্চের সুইচ অফ করে জিভ দিয়ে 'চুক চুক' আর দু'আঙুলে চুটকি বাজিয়ে কুকুরটাকে কাছে ডাকলেন তিনি। সন্দিগ্ধ ভাবে ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়াল কুকুরটা, টান টান হয়ে আছে শরীর। এনডারসনের দিক থেকে কোনরকম বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই ছুটে পালাবে। মানুষের সঙ্গ ছাড়া থাকতে পারে না, অথচ মানুষকে দারুণ ভয় করে সে। এর কারণও অবশ্য আছে। তাকে দেখতে পেলেই ঢিল ছোঁড়ে, কিংবা লাঠি নিয়ে তাড়া করে আসে লোকে। নেড়ি কুত্তার বাচ্চা বলে গাল দেয়। তবু তাদের উচ্ছিষ্ট হাড় অথবা মাছের কাঁটা, নিদেন পক্ষে দু'এক মুঠো ভাতের লোভ ত্যাগ করতে পারে না। ওই সাধারণ জিনিসগুলো জোগাড় করতে গিয়েই মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মারও খেতে হয় তাকে।

এনডারসনের কাছে এসে কিন্তু জীবনে এই প্রথম মানুষের ভালবাসা পেল কুকুরটা। সাথে করে আনা খাবার থেকে কিছু বিস্কট আর একটা স্যাণ্ডউইচ খেতে দিলেন ওটাকে এনডারসন। ওগুলো চেটে পুটে খেয়ে নিয়ে চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল কুকুরটা। তারার আবছা আলোতেও ওটার দু'চোখের কৃতজ্ঞ দৃষ্টি চোখ এড়ালো না এনডার-

সনের। অত সহজেই খুশি হয়ে ওঠে যারা, তাদের প্রতি কেন যে এত দুর্ব্যবহার করে মানুষ ভেবে ঠিক করতে পারলেন না তিনি। আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে বার দু'য়েক এনডারসনের পা চেটে দিয়ে তার পায়ের কাছেই গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল কুকুরটা, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে।

কাটতে থাকল সময়। মাঝরাত হল। বনের প্রান্তে কোন গাছের ডালে বসে ডেকে উঠল একটা হর্ন'ড আউল (শিংওয়ালা পেঁচা)। দীর্ঘ, রহস্যময় 'হু-ও-ও-ও হু-ও-ও-ও' শব্দ করে যেন মৃত্যুর ওপার থেকে ডাকছে পাখীটা। মনে হচ্ছে ওটা পাখীর ডাক নয়, হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসে করুণ সুরে বিলাপ করছে কোন জীবন-মৃত আত্মা, ফিরে আসতে চাইছে তার হারিয়ে যাওয়া জীবনে, বছরের পর বছর যেখানে সুখ-দুঃখে কালাতিপাত করে গেছে সে অতীতে। শিউরে উঠলেন একবার এনডারসন, অকারণেই খারাপ হয়ে গেল মনটা।

অতি ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে একঘেয়ে বিষণ্ণ প্রহর-গুলো। রাত একটা বাজল, দু'টো, তিনটে। আবছা অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা করছে এনডারসনের। আকাশের দিকে একবার চোখ তুলে চাইলেন তিনি। মেঘমুক্ত উজ্জ্বল আকাশে তারার ঝিকিমিকি। এনডার-সনের মনে হল, তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে যেন মিটি মিটি হাসছে ওগুলো। ধুলো আর ধোঁয়া ভর্তি শহরের আকাশে কখনও

তারার এই রূপ দেখতে পাওয়া যাবে না।

ঠিক এই সময়ে চেঁচিয়ে উঠে বিপদ সংকেত জানাল একটা প্লোভার। গাঁয়ের একেবারে প্রান্তে, একটা কাদা-ভর্তি ছোট্ট ডোবার পাড়ের কোন গাছে বসে একটানা চেঁচিয়েই চলল পাখীটা। নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক কিছু একটা দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ওটা। পাখীটা ডাকতে শুরু করতেই জেগে উঠল এনডারসনের গায়ের কাছে শুয়ে থাকা নেড়ি কুকুরটা, মাথা তুলে চাইল একবার শব্দের উৎসের দিকে, তারপর কি মনে করে আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

কয়েক মিনিট পরই আবার জেগে উঠল কুকুরটা, কেন যেন অত্যন্ত সতর্ক হয়ে গেছে ওটা। খাড়া হয়ে উঠেছে ঝুলে পড়া কান দুটো। এনডারসনের একেবারে পা ঘেঁষে এল কুকুরটা, মৃদু মৃদু কাঁপছে ওটার শরীর, গলা থেকে বেরোচ্ছে চাপা গোঁ গোঁ শব্দ। লক্ষ্য করলেন এনডারসন, গাঁয়ের শেষ প্রান্তের কাদাভর্তি ডোবাটার দিকেই তাকিয়ে আছে কুকুরটা।

অপলক দৃষ্টিতে সেদিকেই তাকিয়ে থাকলেন এনডারসন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছুই চোখে পড়ল না তাঁর। হঠাৎ দেখলেন, ডোবার দশ গজ দূরের রাস্তাটার ডান পাশের একটা ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে আসছে একটা ছায়া, মুহূর্ত পরেই আবার কোথায় হারিয়ে গেল ওটা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ছায়াটা কোথায় গেল ভাবছেন এনডারসন, এমন সময় আবার ওটা নজরে পড়ল

তাঁর। এবারে আর একটু কাছে।

রাইফেলের বাঁটটা কাঁধে ঠেকিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল টর্চের বোতামের ওপর আলতো ভাবে রেখে তৈরি হয়ে থাকলেন এনডারসন। শ্বাস ফেলতেও যেন ভয় হচ্ছে তাঁর। পেরিয়ে গেল আরও কয়েক মিনিট। বড়জোর পাঁচ কি ছয় মিনিট, কিন্তু এনডারসনের মনে হল কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে। তারপরই বিশ গজ দূরের একটা ঘরের চালে একটা বিশাল ছায়াকে লাফিয়ে উঠে পড়তে দেখলেন তিনি। এই ঘরটার কাছ থেকে সারি সারি ঘর চলে এসেছে এনডারসন যে উঠোনে বসেছেন সেই উঠোনের ধার পর্যন্ত। আন্দাজ করলেন তিনি, এক চাল থেকে আর এক চালে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে এসে একপাশ থেকে তাকে আক্রমণ করার ফন্দি করেছে চিতাটা।

আস্তে করে উঠে দাঁড়িয়ে পিছিয়ে এসে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন এনডারসন। এই ভাবে দাঁড়ানোয় চালের বেরিয়ে থাকা বাড়তি অংশটুকু (প্রায় আঠার ইঞ্চির মত) ওপর থেকে প্রায় ঢেকে দিল তাঁকে। এতে চালের ওপর থেকে এনডারসনকে সহজে দেখতে পাবে না চিতাটা। ডান হাতের তর্জনী ট্রিগারে আর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল নলে বাঁধা টর্চের বোতামে রেখে রাইফেল হাতে তৈরি হয়ে থাকলেন এনডারসন। ডান বগলের নিচে কনুই দিয়ে চেপে ধরে রাখলেন রাইফেলের বাঁট, নলের মুখ আকাশের দিকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর একটা অতি ক্ষীণ আওয়াজ কানে এল এনডারসনের। সময় থাকতেই ঘরের চালে কাঁটাঝোপ-গুলো বিছিয়ে রেখেছিলেন বলে মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিলেন তিনি। কারণ ওই ঝোপগুলো মাড়িয়ে আসতে গিয়েই অতি সামান্য হলেও শব্দ করে ফেলেছে চিতাটা। দুরু দুরু বুকে ওটার ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষা করতে থাকলেন এনডারসন, কিন্তু আর কোন সাড়া-শব্দ নেই জানোয়ারটার দিক থেকে। একটু ঘাবড়ে গেলেন তিনি, কারণ চিতাটা চুপ করে যাওয়ায় ওটা কোথায় কি অবস্থায় থেকে কি করছে কিছুই জানতে পারছেন না।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মাঝে কেটে গেল পরবর্তী পনের মিনিট। যে কোন সময় তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে চিতাটা, এজন্যে সম্ভাব্য প্রতিটি দিকে নজর রাখতে হচ্ছে এনডারসনকে। এ-রাতে আকাশটা পুরোপুরি মেঘমুক্ত রেখেছেন বলে মনে মনে বার বার ধন্যবাদ দিলেন তিনি ঈশ্বরকে। এতক্ষণ তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছিল কুকুরটা, হঠাৎ তীরের মত ছুটে গিয়ে রাস্তার ওপর ব্রেক কষে দাঁড়াল ওটা, ঘুরে দাঁড়িয়ে এনডারসন যে ঘরের বেড়ার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে আত্মগোপন করে আছেন সেটার নির্দিষ্ট একটা কোণের দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত গলায় চেঁচাতে শুরু করল।

কুকুরটার ওই ভয়ানক চেঁচামেচিতেই সে-যাত্রা প্রাণ রক্ষা পেল এনডারসনের। কারণ এর ঠিক পাঁচ সেকেণ্ড

পরই কুকুরটার নির্দেশিত দিক থেকে বেরিয়ে বিদ্যুতের মত তাঁর দিকে ছুটে এল চিতাটা। ওদিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি এনডারসন, কাজেই বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গেলেন তিনি। এবং কোনমতে আকাশের দিকে উঁচু করে রাখা রাইফেলের নল নিচু করে পাশে ঘুরিয়ে টর্চের সুইচ টিপতে টিপতে তাঁর এক গজের মধ্যে এসে গেল চিতাটা। টর্চের আলোয় একটা ভয়ঙ্কর-দর্শন মুখ চোখে পড়ল এনডারসনের। সেই বিকট হাঁ-এর ভেতর ঝকঝকে সাদা তীক্ষ্ণধার দাঁত, টকটকে লাল জিভ আর পান্না-সবুজ চোখের চাহনি দেখলে অতি বড় সাহসীরও বুক কেঁপে যাবে। অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতই রাইফেলের ট্রিগার টিপে দিয়ে একলাফে পাশে সরে গেলেন এনডারসন। হাঁ করা মুখের ভেতর দিয়ে ঢুকে খুলিটাকে গুঁড়ো করে দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রচণ্ড শক্তিশালী ·৪০৫ বুলেট। কিন্তু থামল না চিতাটা, গতিবেগ সামলাতে না পেরে এগিয়ে এসে ধাক্কা খেল ঘরের বেড়ার গায়ে। তারপর আস্তে করে ঢলে পড়ল একপাশে। দরকার ছিল না, তবুও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে, ওই হলুদের ওপর কালো ফোঁটাওয়ালা শয়তানের দেহে আরও দুটো বুলেট ঢুকিয়ে দিলেন এনডারসন।

বার দু'য়েক পা ঝাঁকুনি আর একবার লেজটাকে দু'দিক থেকে টেনে ধরা দড়ির মত টান টান করেই নিথর হয়ে গেল চিতার দেহটা। এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ-ছিল কুকুরটা, এবারে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃত প্রাণীটার

ওপর, দাঁত বসিয়ে দিল গলায়। কামড়ে ধরে বার কয়েক টানাহেঁচড়া করেই আবার ফিরে এল এনডারসনের কাছে।

পরদিন ভোরে চামড়া ছাড়াতে গিয়েই চিতাটার ডান থাবায় বিঁধে যাওয়া শজারুর কাঁটা দুটো আবিষ্কার করলেন এনডারসন। অবস্থা দেখেই বোঝা যায়, বহুদিন আগেই ওটার থাবার দুটো নখের মাঝখানের চামড়া ভেদ করে মাংসের গভীরে ঢুকে যায় কাঁটা দুটো। হাঁটতে গেলেই কাঁটার খোঁচা লাগত হাড়ের গায়ে, এতে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করত চিতাটা। আর শিকার করার সময় ওই থাবা ব্যবহার করার তো কোন প্রশ্নই উঠত না। অতএব স্বাভাবিক শিকার ধরা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল সে। শেষ পর্যন্ত পেটের দায়ে বাধ্য হয়েই সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ শিকার মানুষের দিকে ঝুঁকেছিল এবং মানুষ শিকার করতে এসেই সেদিন প্রাণ দিল হতভাগ্য প্রাণীটা এক দুঃসাহসী মানুষের হাতে।

এভাবেই শেষ হল গুম্মালাপুরের মানুষখেকো চিতা, যার পৈশাচিক কার্যকলাপ আর ধুরন্ধরতা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এর আগে এনডারসনের মারা আর সব মানুষখেকোকে।

নেড়ি কুকুরটাকে সাথে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন এনডারসন। ভাল করে ওটার গা ধুইয়ে দিয়ে নাম রেখেছিলেন 'নিপার'। এরপর বাকি জীবনটা তাঁর কাছেই কাটিয়েছে নিপার। ওকে দেখলে প্রায়ই সেই দিনটির কথা

মনে পড়ে যেত এনডারসনের, যেদিন মাত্র কয়েকটা বিস্কুট এবং একটা স্যাণ্ডউইচের পরিবর্তে তাঁকে আপন করে নিয়েছিল নিপার, আর দু'ঘণ্টা যেতে না যেতেই ওই সামান্য ঋণ সুদে আসলে শোধ করে দিয়েছিল তাঁর প্রাণ রক্ষা করে।

তল্লাদেশের মানুষখেকো

মানুষখেকোটার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছেন আলমোড়ার ডেপুটি কমিশনার বিল বেনেস। আলমোড়ার অন্তর্গত তল্লাদেশের এবং তার আশপাশের গ্রামগুলিতে গত আট বছর ধরে দেড়শোরও বেশি মানুষ মেরেছে মানুষখেকোটা, অথচ তাকে মারতে পারছে না কেউ। অগত্যা জিম করবেটকে এসে পাকড়াও করলেন বেনেস। তাঁর ইচ্ছা করবেটকে একবার ওই মানুষখেকোটা মারার চেষ্টা করে দেখতে হবে। বেনেসের দৃঢ় বিশ্বাস কেবল মাত্র করবেটের পক্ষেই বাঘটাকে মারা সম্ভব।

অথচ যাবার মত অবস্থা তখন করবেটের নেই। কিছুদিন আগে হাতি দিয়ে খেদিয়ে শিকার করতে গিয়ে বাঁ কানের পর্দা ফেটে গেছে। হাওদার পেছনে রাইফেল হাতে একজন শিকারী বসে ছিল, শিকারীর রাইফেলের মাযলটা ছিল একেবারে করবেটের কানের পাশে। দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ

গুলি বেরিয়ে যায় রাইফেলটা থেকে। কানের কাছে ভারি রাইফেলের প্রচণ্ড আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যায় করবেটের। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নৈনিতালের র‍্যামসে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়া হল তাঁকে। কিন্তু ডাক্তারদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু হল না। অকেজোই হয়ে গেল তাঁর বাঁ কানটা। বেনেসের মানুষখেকো মারার অনুরোধ জানানোর মাত্র কয়েকদিন আগে কানের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হওয়ায় আবার হাসপাতালে গিয়েছিলেন করবেট। ভালমত পরীক্ষা করার পর হাসপাতালের সিভিল সার্জন সন্দেহ প্রকাশ করলেন কানের ভেতর একটা ফোঁড়া উঠতে যাচ্ছে তাঁর।

কমিশনার বেনেসের অনুরোধ ঠেলতে না পেরে শরীরের এই অবস্থা নিয়েও তল্লাদেশ যেতে রাজি হয়ে গেলেন জিম করবেট। প্রবল আপত্তি জানালেন করবেটের দুই বোন। ওদের বোঝালেন তিনি, 'আসলে মানুষখেকো মারতে যাচ্ছি না আমি। যাচ্ছি একটু হাওয়া পরিবর্তন করতে। ফোঁড়াটোড়া কিচ্ছু না, আসলে খোলা পাহাড়ী হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে দু'দিনেই কানের ব্যথা ভাল হয়ে যাবে আমার।'

চৌঠা এপ্রিল নৈনিতাল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন করবেট, সঙ্গে নিলেন ছ'জন গাড়োয়ালীকে। এদের মধ্যে ভারবাহক মাধো সিং, রাম সিং, বাবুর্চী এলাহাই আর গঙ্গারাম নামের এক উৎসাহী ব্রাহ্মণ—ফাইফরমাস খাটাই এর কাজ, এই চারজনকে আগে থেকেই চেনেন তিনি। প্রায় চৌদ্দ মাইল পথ

পায়ে হেঁটে এসে কাঠগুদাম থেকে বিকেলের দিকে ট্রেনে উঠলেন করবেট। বেরিলি, পিলিভিট হয়ে পরদিন দুপুরে ট্রেনটা এসে পৌঁছুল টনকপুরে। এখানকার আদালতের এক পেশকারের কাছে জানা গেল আগের দিন মানুষখেকোটার হাতে একটা ছেলে মারা গেছে, আরও জানা গেল, করবেটের যাত্রার খবর পেয়েই সে-এলাকায় বাঘের টোপ হিসেবে দুটো মোষ পাঠিয়ে দিয়েছেন বেনেস। দুপুরের খাওয়া এখানেই সেরে নিয়ে কালাধুঙ্গা রওনা দিলেন করবেট।

প্রায় চব্বিশ মাইল পথ পেরিয়ে গভীর রাতে এসে পৌঁছুলেন তিনি কালাধুঙ্গা রেস্টহাউসে। বাকি রাতটা সেখানেই কাটিয়ে পরদিন ভোরে ভোরেই আবার রওনা হলেন। সারদা নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে চুকা পেরিয়ে একটা পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছুলেন, এই পাহাড়ের ওপরের গ্রামেই সেই ছেলেটিকে মেরেছে মানুষখেকো। এখানে ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নিয়ে লাঞ্চ সেরে নিলেন তাঁরা।

আবার যাত্রা শুরু হল। বিকেলের পড়ন্ত রোদের দিকে মুখ করে গাছপালাশূন্য এক সাংঘাতিক খাড়াই বেয়ে উঠতে লাগলেন অভিযাত্রীরা। চার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায় সোজা উঠে গেছে পথটি। বার বার বিশ্রাম নিয়ে সূর্য ডোবার মিনিট কয়েক আগে পর্বতশৃঙ্গ থেকে হাজার ফুট নিচে এক গ্রামে এসে পৌঁছুলেন তাঁরা। এ গ্রামের বেশ কিছু লোককে হত্যা করেছে মানুষখেকোটা।

করবেটকে দেখে খুব খুশি হল গ্রামবাসীরা। রাতের

খাবার শেষ হলে একটা বদ্ধ ঘরে থাকতে দেয়া হল তাঁদেরকে। কিন্তু ও ঘরে না থেকে কাছেই একটা ঝর্ণার ধারে গাছের তলায় বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন করবেট। মাথার কাছে জ্বালিয়ে রাখলেন হারিকেনটা, পাশে রাইফেল।

সারাদিনের পরিশ্রমের পরও বিছানায় শুয়ে সহজে ঘুম এল না করবেটের। সমস্ত মন জুড়ে আছে মানুষখেকোটার চিন্তা। প্রত্যেক গ্রামের মোড়লকে শিকারীর আগমন সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন বেনেস, এবং বলে দিয়েছেন ইতিমধ্যে কোন মানুষ যদি বাঘের হাতে মারা পড়ে তাহলে তা যেন করবেট পৌঁছার আগে সরান না হয়। টনকপুরের পেশকারের কাছে শোনা সেই ছেলেটি মারা পড়েছে চৌঠা এপ্রিল, আজ ছয়। সুতরাং বেনেসের নির্দেশানুযায়ী যদি মৃতদেহ নাও সরায় গাঁয়ের লোকে, তাহলেও করবেট পৌঁছে ওটার কিছুই অবশিষ্ট পাবেন না। কারণ একটা ছেলেকে খেয়ে শেষ করতে বাঘের পক্ষে এক দিনই যথেষ্ট। এসব কথা চিন্তা করতে করতেই একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন করবেট।

খুব ভোরে এসে করবেটকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল গঙ্গারাম। আঁধার কাটেনি তখনো। ঘুমিয়ে থাকাকালীন বোধহয় দমকা বাতাসেই নিভে গিয়েছিল পাশে রাখা হারিকেনটা, এখন আবার সেটা জ্বালিয়ে দিল গঙ্গারাম। নাস্তা তৈরি হতে হতেই পাশের ঝর্ণায় গোসল সেরে নিলেন করবেট। নেপাল পাহাড়ের ওপার থেকে সূর্য ওঠার আগেই ·২৭৫ রিগবি মশার রাইফেল পরিষ্কার করে তাতে পাঁচ রাউণ্ডের পুরো

একটা ক্লিপ লাগিয়ে ফেললেন তিনি। তারপর ভাল করে পেট পুরে খেয়ে নিয়ে লোকজনসহ বেরিয়ে এলেন গ্রাম ছেড়ে।

খাড়াই পাহাড়ী পথের ধারে কাছে এসে নিচে তাকালেন একবার। ওখানে সারদার উপত্যকায় ছায়া ঢাকা গভীর বন। বন আর নদীর ওপরে মাঝে মাঝে ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে ঘন কুয়াশা। পাহাড়ের পাদদেশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে টনকপুর পর্যন্ত চলে গেছে অপরূপ সুন্দর পাহাড়ী নদীটা, সেখান থেকে চকচকে রূপালী ফিতার মত এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে দিগন্ত পর্যন্ত। চোখ ফেরান যায় না দৃশ্যটা দেখলে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আগের দিনের পাহাড়ী পথটা বেয়েই আরও ওপরে উঠতে শুরু করলেন অভিযাত্রীরা। এঁকে বেঁকে থক পর্যন্ত উঠে গেছে পথটা। পথের শেষ মাথায় অবস্থিত শত বৎসর আগের চাঁদ রাজাদের প্রতিষ্ঠিত পূর্ণ-গিরি মন্দিরের চূড়ায় রঙিন পাথরে তখন অপূর্ব বর্ণালীর সৃষ্টি করেছে ভোরের সূর্য।

চূড়ায় পৌঁছে পথটি পুব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটা বুনো পথের সাথে গিয়ে মিশেছে। এখানে এসে একটু ভাবনায় পড়লেন করবেট। কোন গ্রাম চোখে পড়ছে না, কোন্‌দিকে যেতে হবে তাও জানা নেই। পুব দিকে গেলে সারদা পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারবেন। মনস্থির করে নিয়ে চারপাশের প্রকৃতির বিচিত্র-শোভায় চোখ আর মন ভরাতে ভরাতে দলবল নিয়ে সেদিকেই হাঁটতে থাকলেন করবেট।

এপ্রিলেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে হিমালয়ের এদিকটায়। গাছে গাছে গজিয়েছে নতুন পাতা। সবুজের মাঝে মাঝে চোখ ধাঁধানো রূপ নিয়ে ফুটে আছে ভায়োলেট, বাটার কাপ, রডোডেনড্রন আর বুনো অর্কিড। বুলবুল, ব্যাবলার, মিনিভেট, টিট—যারা শীতের হিমেল হাওয়ার ঝাপটায় পাহাড় ছেড়ে পালিয়েছিল এক এক করে, আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে সবাই। তাদের ডাকে মুখরিত হয়ে আছে চারপাশের ঝোপঝাড়, বন-জঙ্গল। এর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিশ্বাসই করা যায় না অপূর্ব এই দৃশ্যপটের প্রায়ান্ধকার কোন ঝোপের ভেতরই ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতে পারে ভয়ঙ্কর মানুষখেকো বাঘ। চলার পথে এখানে ওখানে হঠাৎ করে বাঘের পায়ের ছাপও চোখে পড়ছে, এ ছাপ মানুষখেকোটারও হতে পারে। কারণ এ অঞ্চলেই বেশি গোলমাল পাকাচ্ছে মানুষখেকোটা। সারা পথেই ছড়িয়ে আছে কাকর, শম্বর, ভালুক, শূয়োর আর চিতার পায়ের ছাপ। ক্রমেই বেড়ে চলেছে পাখীর সংখ্যা। আরো এগিয়ে ধবধবে সাদা প্রজাপতি অর্কিডের দেখা পেল অভিযাত্রীরা। ঝর্ণার মত নেমে এসে ঠাঁই দেয়া গাছের কাণ্ডকে প্রায় ঢেকে দিয়েছে ফুলগুলো। এদের মাঝেই এক জায়গায় দেখা গেল হিমালয়ের কাল ভালুকের বাসা। বাসাটার পরতে পরতে লেগে আছে অসামান্য শিল্পীর হাতের ছোঁয়া। একদিন বিশাল একটা ওক গাছ ফুট চল্লিশেক ওপর থেকে হয়তো বিদ্যুৎ পাতের ফলে

অথবা ঝড়ের দাপটে ভেঙে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল। ভাঙা জায়গাটার চারদিক ঘিরে মানুষের পায়ের হাড়ের মত দেখতে মোটা কতগুলো ডাল বেরিয়ে সোজা উঠে গিয়েছিল ফুট তিনেক ওপরে। ডালের গায়ে প্রথমে শ্যাওলা জমেছিল, সেই শ্যাওলায় শেকড় গেড়ে ঝাড় নামিয়েছে প্রজাপতি অর্কিড। এই ঝাড়শুদ্ধ ডালের মাথাগুলোকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে এনে একটার সাথে আর একটাকে জুড়ে দিয়েছে ভালুকটা। এটাই ওর বাসা। এ বাসার সাথে বছরের অধিকাংশ সময়ই ওর সম্পর্ক বিশেষ একটা থাকে না। কারণ শীতের মাসগুলোতে মধু আর খেজুরের রস খাবার জন্যে পাহাড়ের গোড়ায় নেমে যায় সে। শীতকালে থাকার জন্যে সেখানেও আরেকটা বাসা বানায়, তাতে পিঁপড়ে আর মশা মাছির হাত থেকে বাঁচার, এমন কি বাসার বাইরে বসে রোদ পোহাবার ব্যবস্থাও করে নেয়া হয়।

এসব দেখতে দেখতেই প্রায় এক ঘন্টা হেঁটে আসার পর শেষ হল বনের সীমানা। বন থেকে বেরিয়েই কয়েকশো গজ দূরের গ্রামটা চোখে পড়ল করবেটের। গ্রামে ঢোকার আগেই তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে এল গ্রামের ছেলে বুড়োরা। বন থেকে বেরোনোর পরই দেখতে পেয়েছে ওরা তাঁকে, দেখেই আন্দাজ করে নিয়েছে কে হতে পারেন তিনি। এমনিতেই কুমায়ূনের এই সুদূর গ্রামের বাসিন্দারা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, তার ওপর করবেট ওদের বিশেষ অতিথি। অতএব করবেটকে মাথায় তুলে শুধু নাচতে বাকি

রাখল ওরা। প্রথমেই তাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করা হল গ্রামের মোড়ল-বাড়িতে। বাড়ির উঠোনে আগেই পশমী কার্পেট বিছিয়ে তার ওপর অতিথির জন্যে মোড়া পেতে রাখা হয়েছিল। এখন সেই মোড়ায় বসিয়ে ঘন করে জ্বাল দেয়া এক গ্লাস দুধ খেতে দেয়া হল তাঁকে। এ দেশেই জন্মেছেন করবেট, আর এখানেই মানুষ হয়েছেন তিনি। সুতরাং এখানকার পাহাড়ীদের ভাষা তাঁর জানা। ওদের সাথে কথা বলার সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করল গ্রামের লোকেরা এত ভোরে কোত্থেকে এসে উদয় হয়েছেন তিনি। সবচেয়ে কাছের সাহেব থাকার বাংলোটি তো ত্রিশ মাইল দূরে, সেই কালাধুঙ্গায়। আসলে সাগর পারের সাহেব হয়ে ছোট্ট পাহাড়ী গাঁয়ে ঝর্ণার ধারে গাছের নিচে রাত কাটাতে পারেন করবেট একথা ঘুমের ঘোরেও ভাবতে পারে না ওরা। দুধ খাওয়া শেষ হলে সিগারেট বের করে ধরালেন করবেট, ওদের মধ্যেও বিলিয়ে দিলেন কয়েকটা। সিগারেট খেতে খেতেই আলাপ আলোচনা চলল। গ্রামটির নাম তামালি, বহুদিন ধরেই মানুষখেকোটা জ্বালাচ্ছে ওদেরকে। কারো মতে আট বছর, আবার কারো দশ। তবে যে বছর বাচি সিং জঙ্গলে গাছ কাটতে গিয়ে বেমক্কা কুড়ালের কোপে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলে, যে বছর দান সিং ত্রিশ টাকা দিয়ে কালো ষাঁড়টা কিনে আনার পরদিনই পাহাড় থেকে পড়ে মরে যায়, সে বছরই মানুষখেকোটার আবির্ভাব হয়েছে এ বিষয়ে সবাই একমত। মানুষখেকোর হাতে

এ এলাকায় সবশেষে প্রাণ দিয়েছে ফুন্দনের মা। সে-দিন মার্চের বিশ তারিখ ছিল এটা জানাতে পারল মোড়ল। মানুষখেকোটা বাঘ না বাঘিনী এটা বলতে পারবে না ওরা, তবে সবাই একবাক্যে বলল সাধারণের তুলনায় অনেক বড় জানোয়ারটা। মানুষখেকোটার ভয়ে এমন আতঙ্কিত হয়ে আছে তামালির লোকেরা যে দূরের জমিগুলোতে চাষ করতে যেতেও সাহস পায় না কেউ। আর টনকপুর কেমন তাতো ভুলতেই বসেছে ওরা। কথা বলে যতদূর বোঝা গেল বাঘটা গত আট বছর ধরে তামালিতে স্থায়ী ভাবে বাস করছে, তবে মাঝে মাঝেই শিকারের সন্ধানে আশ-পাশের গ্রামগুলোতে যাতায়াত করে। কাজেই তামালিতে থাকলেই বাঘটিকে মারার বেশি সুযোগ পাওয়া যাবে, ভাবলেন করবেট। কিন্তু যেখানে শেষ মানুষ মেরেছে বাঘটা, সে-গ্রামটা এখন একবার ঘুরে আসা উচিত ভেবে, শীঘ্রই ফিরে আসবেন কথা দিয়ে, গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করে উঠে পড়লেন তিনি। তামালি থেকে বেরোনো পথটা আর করবেট যে পথে এখানে এসেছেন সেই বুনো পথটার সঙ্গমস্থলে তাঁর লোকদের উদ্দেশ্যে একটা চিহ্ন রেখে এসেছেন তিনি। বোঝা বয়ে চলতে হচ্ছে বলে অনেক পেছনে পড়ে গেছে ওরা। চিহ্নটা দেখেই ওরা বুঝতে পারবে পুব দিকে গেছেন করবেট। এখন আবার সঙ্গমস্থলটায় পৌঁছে পশ্চিম দিকে যাচ্ছেন তিনি এবং পুবের রাস্তা বন্ধ, এ চিহ্ন রাখলেন। চিহ্নটা সোজা, এবং এসব পাহাড়ী এলাকায় বহুল

প্রচলিত। রাস্তার ওপর পাথর বা কাঠের টুকরোয় ভর দিয়ে শুধু একদিকে পাতাওয়ালা একটি ডাল দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়, গাছের পাতাগুলো যেদিকে মুখ করে থাকবে সেদিকেই যাওয়ার নির্দেশ আছে বুঝতে হবে, আর এরকম একদিকে পাতাওয়ালা দুটো ডালকে ক্রস চিহ্নের মত করে রাখলে পাতাগুলো যে দিক নির্দেশ করবে, বুঝতে হবে সে-দিকের পথ বন্ধ।

বনের মধ্যে দিয়েই গেছে পশ্চিমের রাস্তাটাও, তবে এখান-কার প্রকৃতি একটু অন্য রকম। আশপাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল সব ওক, গোড়ায় হাঁটু সমান ফার্ণের ঝোপ। মাঝে মাঝে ওক গাছের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে দূর পাহাড়ের সারি, তার ওপাশে হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গ।

পশ্চিম দিকে মাইল চারেক এগোবার পর উত্তরে ঘুরে গিয়ে একটা উপত্যকার একটু ওপরে পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে রাস্তাটা। উপত্যকার নিচে ছোট্ট নদী। বাঁ দিকে ওক গাছে ছাওয়া ঘন বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে নদীটা। নদীর ওপারেই খোলা জায়গার পর একটা গ্রাম। নদী পেরিয়ে খোলা জায়গার ওপর দিয়ে হেঁটে এসে গ্রামটায় পৌঁছুলেন করবেট। মোড়লের কাছে জানা গেল গ্রামটির নাম তল্লাকোট। করবেট নৈনিতাল থেকে রওনা হওয়ার একদিন পর, অর্থাৎ ৫ই এপ্রিল এই গাঁয়েরই একটি মেয়েলোক মারা গেছে মানুষখেকোর হাতে। সেই-

দিনই বেনেসের নির্দেশ নিয়ে লোক এসেছে এ গাঁয়ে, সুতরাং মড়িটাকে তারা সরায়নি। গাঁয়ে পৌঁছে গাঁয়েরই একজন লোককে মড়িটার খোঁজে পাঠালেন করবেট এবং যদি তার কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে ওটার কাছাকাছি বসার জন্যে একটা মাচা তৈরিরও নির্দেশ দিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর মড়ি খুঁজতে যাওয়া লোকেরা এসে জানাল, শুধু মেয়েটার দাঁতগুলো তারা খুঁজে পেয়েছে।

মেয়েলোকটাকে কোথায় মারা হয়েছে তা কেউ চেনে কিনা এবং জায়গাটা দেখাতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করলেন করবেট। বছর সতের বয়সের একটা ছেলে জানাল, সে জায়গাটা চেনে এবং নিয়ে যেতে পারবে তাঁকে। আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ছেলেটি, পেছনে করবেট, তাঁর পেছনে চলল গ্রামের ছেলে বুড়ো মেয়েদের ছোটখাট একটা মিছিল। চলতে চলতে দুটো পাহাড়ের মাঝখানের এক বিরাট উপত্যকায় এসে পৌঁছুলেন করবেট এবং ছেলেটি। উপত্যকার উত্তর দিকটায় ঘাসের জঙ্গলের এখানে ওখানে উইয়ের ঢিবির মত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কিছু ঝোপঝাড়, উল্টোদিকে ঘন আগাছার পরেই ছোট বড় গাছের জঙ্গল। তাদের কাছ থেকে তিনশ গজ দূরে, শ'পাঁচেক গজ নিচে ঘাসের জঙ্গলের প্রান্তে মেয়ের সাথে বসে ঘাস কাটছিল মেয়েলোকটি। ওখানে মেয়ের সামনেই মাকে মেরে আরো একশ গজ দূরের নালার কাছে লাশটাকে টেনে নিয়ে যায় বাঘ। আঙুল তুলে নালার পাড়ের ওক গাছটা দেখাল

ছেলেটা, বলল, ঐ গাছের নিচেই পরে মেয়েলোকটির অর্ধভুক্ত দেহটা দেখতে পেয়েছিল গাঁয়ের লোকেরা।

তল্লাকোট এসে পৌঁছায়নি তখনো করবেটের লোকেরা। সুতরাং নদীর ধারের খোলা জায়গায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিতে বললেন মোড়লকে করবেট। তারপর বাঘটার কোন হদিস পাওয়া যায় কিনা তা খুঁজে দেখতে চললেন। প্রায় জোর করেই করবেটের সঙ্গ নিল দুঙ্গার সিং—সতর বছরের ছেলেটি। কথায় কথায় করবেটকে জানাল ছেলেটি, কিছুদিন আগে তার মাকেও বাঘে খেয়েছে।

আগের পথে না গিয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটা সরু পথ ধরে এগোলেন করবেট আর দুঙ্গার সিং। গ্রাম থেকে বেরিয়ে ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে পথ করে চলতে চলতে ছেলেটিকে বললেন করবেট, 'দুঙ্গার সিং, আমার একটা কান অকেজো হয়ে গেছে। যদি কোন কিছু আমাকে দেখাতে চাও তো থেমে পড়ে চোখের ইশারায় দেখাবে। আর তখন কথা বলার প্রয়োজন থাকলে ডান কানের কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলবে, বুঝেছ?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল দুঙ্গার সিং। শ'চারেক গজ এগোনোর পর থেমে পড়ে পেছনে চাইল সে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলেন করবেট, তাদের দিকেই দ্রুত এগিয়ে আসছে পাটোয়ারী—এই লোকই বেনেসের নির্দেশ নিয়ে এসেছিল, পেছনে পেছনে তার বন্দুকটা বয়ে আনছে এক-জন লোক। কোন সংবাদ দিতে আসছে বোধহয় পাটো-

য়ারী। কিন্তু না, করবেটের সাথে যাবার উদ্দেশ্যেই আসলে এসেছে সে। ভারি জুতো পরে এসেছে পাটোয়ারী। এ নিয়ে হাঁটতে গেলে শব্দ হতে বাধ্য। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে সঙ্গে নিতে রাজি হলেন করবেট।

ঘন আগাছার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আরও শ'চারেক গজ এগিয়ে একটা ছোট্ট খোলা জায়গায় এসে পৌঁছুলেন তাঁরা। পায়ে চলা সরু পথটা এখানে দু'ভাগ হয়ে একটা বাঁয়ে মোড় নিয়ে চলে গেছে গভীর নালার দিকে, ডানেরটা পাহাড় ঘুরে চলে গেছে ওপাশে। নালার দিকের পথটা দেখিয়ে দুঙ্গার সিং বলল ওখানেই বাঘে খেয়েছিল তার মাকে। মানুষখেকো বাঘকে খুঁজতে যাচ্ছেন করবেট, সুতরাং সেখানে পাটোয়ারীর মত মাথামোটা বুট পরা লোককে নিয়ে গেলে বাঘকে হুঁশিয়ার করে দেবেই সে। তাই দুঙ্গার সিং সহ তিনজনকে ওখানেই অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন করবেট। তাঁর কথা শেষ হবার আগেই কি দেখে ঘুরে দাঁড়াল দুঙ্গার সিং, সাথে সাথেই ঘুরে দাঁড়ালেন করবেটও। ওপাশের পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখলেন, দুই পাহাড়ের উপত্যকায়—যেখানে একটু আগে গাঁয়ের লোকেরা দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এখনও বেশ কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। চেঁচিয়ে কি যেন বলছে ওরা তাঁদেরকে। কান ভাল না থাকায় ঠিকমত শুনতে পেলেন না করবেট, তবে দুঙ্গার সিংএর কাছে জানা গেল, তার ভাই বলছে, ওখান থেকে একটু নিচে একটা পোড়ো জমিতে একটা জানোয়ার শুয়ে

আছে, ওটার গায়ের রঙ দেখে ওটাকে বাঘ বলেই সন্দেহ করছে ওরা।

দুঙ্গার সিং এর হাতে রাইফেলটা দিয়ে পাটোয়ারী আর তার সঙ্গীকে নিয়ে গিয়ে কাছের একটা গাছে উঠিয়ে দিলেন করবেট। বার বার হুঁশিয়ার করে দিলেন, যদি জানের মায়া থাকে তাহলে ওরা যেন গাছ থেকে না নামে। অবশ্য হুঁশিয়ার না করলেও চলতো। বাঘ শব্দটি শুনেই গলা শুকিয়ে গিয়েছিল ওদের। গাছের যতটা উঁচুতে ওঠা সম্ভব তার চেয়ে বেশি উঁচুতে উঠে যাবার চেষ্টা করছে ওরা এখন। দেখে হাসি চেপে রাখা দায়, অথচ এই পাটোয়ারীই কিছুক্ষণ আগে বীরদর্পে বাঘ মারতে চলেছিল।

দুঙ্গার সিংএর হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে ডানের পথ ধরে এগোলেন করবেট। পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে কেটে তৈরি হয়েছে ফসলের জমি। সামনের জমিটা ফুট দশেক চওড়া আর প্রায় একশ গজ লম্বা। পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত সোজা গিয়েই বাঁয়ে বেঁকেছে জমিটা। দুঙ্গার সিং জানাল, এই জমির ওধার থেকেই বাঘ শুয়ে থাকা জমিটা চোখে পড়বে। মাথা নিচু করে জমির আলের এপাশ ধরে ধরে জমির ও প্রান্তে পৌঁছেই লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লেন করবেট। জমির প্রান্তের প্রায় এক ফুট লম্বা ঘাস সরিয়ে নিচে উঁকি দিতেই ছোট্ট উপত্যকাটা চোখে পড়ল তাঁর। উপত্যকার ওধার থেকে প্রায় খাড়া ভাবে নেমে গেছে ঘাসভূমি, তারপরেই চারা ওকের ঘন জঙ্গল। গভীর নালার

ধার পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে জঙ্গলটা।

ত্রিশ গজ চওড়া ঘাসভূমিটার শেষ প্রান্তের একটু আগে একটা বিশাল পাথরের টিলার চারপাশ ঘিরে জন্মে আছে কয়েকটা গাছ। গাছগুলোর উচ্চতার সাথে মিলিয়ে দেখলে আন্দাজ করা যায় প্রায় একশ ফুট উঁচু পাথরটা। ঘাস-ভূমির পাশেই নব্বই গজ লম্বা যবের খেত, কিন্তু বহুদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় উজ্জ্বল সবুজ পাহাড়ী ঘাসে ছেয়ে গেছে খেতটা। তার মাঝেই এখানে ওখানে জন্মেছে প্রচুর তুলসী গাছ। কয়েকটা তুলসী গাছের কাছেই রোদে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে বাঘ—একটা নয়, দুটো।

দুটোর ভেতর কাছের বাঘটা এদিকে পিঠ দিয়ে পাহাড় মুখো হয়ে শুয়েছে, দ্বিতীয়টা শুয়েছে এর ঠিক উল্টো ভাবে। কাছেরটাকে প্রথমে গুলি করলে দূরেরটা গুলির আওয়াজ শুনে একলাফে নালা পেরিয়ে গভীর বনে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আর দূরেরটাকে প্রথমে গুলি করলে, কাছেরটা হয় পাহাড়ের দিকে উঠে যাবে নাহয় এদিকে চলে আসবে। তখন এটাকে গুলি করার সুযোগ পাওয়া যাবেই। তাড়াহুড়ো নেই, সুতরাং ভালমত নিশানা করে প্রথমে দূরেরটাকেই গুলি করলেন করবেট। একটা পেশীও না নাড়িয়ে পড়ে থাকল বাঘটা, কিন্তু ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল দ্বিতীয় বাঘটা। বৃষ্টির পানি নামার পাঁচ ফুট চওড়া নালাটা এক-লাফে পেরিয়ে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল সে, তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে সঙ্গীর দিকে তাকাতেই

ট্রিগার টিপলেন করবেট। একবার লাফিয়ে উঠেই নালার পা নিতে পড়ে গেল বাঘটা।

সেই মুহূর্তে মাটিতে পড়ে থাকা বাঘটার পেছনের তুলসী ঝোপে একটা নড়াচড়া টের পেলেন করবেট। দেখতে দেখতে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘাসভূমির দিকে ছুটে গেল তৃতীয় বাঘটা, আকারে এটা গুলি খাওয়া বাঘ দুটোর চেয়ে অনেক বড়। রাইফেল তুলে গুলি করার আগেই আর একটা বিশাল আগাছা ঝোপের ভেতরে ঢুকে সামনে ছুটে গেল সে। রাইফেল তুলে তার বেরোনোর অপেক্ষা করতে থাকলেন করবেট। এখান থেকে দু'শ গজ দূরে পাহাড়ের কাছাকাছি গিয়ে ঝোপ থেকে বেরোল বাঘটা। সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপলেন করবেট।

সেখানেই কয়েক মুহূর্ত নিথর পড়ে থাকল বাঘটা, তার-পর সামনের থাবা বাড়িয়ে রেখেই পিছলে নিচে পড়তে শুরু করল। নিচের খাদ থেকে কয়েক ফুট উপরে একটা আট-দশ ইঞ্চি মোটা ওকের চারায় ঠেকে আটকে গেল বাঘের পেটটা, মাথাসহ সামনের পা দুটো ঝুলে রইল গাছের এক দিকে, অন্যদিকে লেজসহ পেছনের পা। আবার গুলি করার জন্যে রাইফেল কাঁধে তৈরি থাকলেন করবেট, কিন্তু বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করল না বাঘটা। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দাঁড়িয়ে উঠে পাটোয়ারীকে ডাকলেন তিনি, সাথে সাথে গাছ থেকে নেমে এগিয়ে এল পাটোয়ারী। তিনটা বাঘকেই মরতে দেখেছে সে, অতএব আর ভয় নেই। খুশিতে হাত

তালি দিয়ে বাচ্চা ছেলের মত নাচতে শুরু করল দুঙ্গার সিং। আগুনের পাশে বসে এরপর বহু রাত এই বাঘ মারার কাহিনী বন্ধুদের শোনাবার মত দৃশ্য দেখে ফেলেছে সে।

কয়েক পা এগিয়ে জমির ধারে পা ঝুলিয়ে বসলেন করবেট। রাইফেলটা হাঁটুর ওপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে সিগারেট ধরালেন, সঙ্গীদেরকেও দিলেন একটা করে। সিগারেট খাওয়া প্রায় শেষ, এমন সময় দেখলেন তিনি চারা গাছে আটকে থাকা বাঘটা নড়তে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে মাথার দিকটা ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে ওটার। চারা গাছ থেকে বাঘের শরীরটা পিছলে বেরিয়ে গিয়ে ঢাল গড়িয়ে থামল এসে পাথরের টিলাটার ধারে। ওটা গড়াতে থাকা অবস্থায়ই রাইফেল তুলে গুলি করলেন করবেট। আসলে বাহাদুরি দেখাবার জন্যেই বাঘটা গড়াতে থাকা অবস্থায় গুলি করেছিলেন তিনি, সঙ্গীদের বোঝাতে চেয়েছিলেন মাটিতে গড়াতে থাকা প্রায় অসম্ভব টার্গেটকেও গুলি বিদ্ধ করতে পারেন তিনি, আর এইটাই চরম ভুল করলেন। টিলাটার কাছে পৌঁছেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল একটু আগের 'মরা' বাঘ, মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘন বনের আড়ালে। বাঘটা গড়াতে থাকা অবস্থায় গুলি না করে রাইফেল কাঁধে তৈরি থাকলে এখন আরামসে ফেলে দিতে পারতেন করবেট ওটাকে।

গতস্য শোচনা নাস্তি। কাজেই উঠে দাঁড়িয়ে নালায় পড়ে থাকা বাঘটাকে দেখতে গেলেন করবেট। কয়েক পা

এগিয়েছেন মাত্র, এমন সময় চেঁচিয়ে উঠল দুঙ্গার সিং, 'আরে, আরে, সাহেব, বাঘটা! ওই-ই যে!' পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালেন করবেট। ওকের বন থেকে বেরিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোণাকোণি পাহাড়ের দিকে উঠে যাচ্ছে বাঘটা। ডান কাঁধ থেকে তার রক্তের ধারা নেমেছে।

করবেট যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার কাছেই পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আছে একটা পাইনের চারা। চারাটার নিচে গভীর খাদ, তার ওপাশ থেকে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়টা। দাঁড়ানো অবস্থায় এখন বাঘটাকে গুলি করা অসম্ভব। কারণ এখন গুলি করতে হলে প্রায় ষাট ডিগ্রী ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তা করতে হবে করবেটকে। এবং সেক্ষেত্রে খাদে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাঁর। শুয়ে যে গুলি করবেন তারও উপায় নেই, কারণ তাহলে দেখা যাবে না বাঘটাকে। সুতরাং বাঁ হাতে চারাগাছটাকে জড়িয়ে ধরে ডান হাতে রাইফেল কাঁধে তুলেই গুলি করলেন তিনি চারশো গজ দূরের বাঘটাকে। ট্রিগার টেপার সময়ই সন্দেহ হয়েছিল তাঁর গুলি লাগবে না, হলও তাই। বাঘের মাথার প্রায় এক ফুট দূরের পাথরে গিয়ে লাগল বুলেটটা। পরোয়াও করল না বাঘটা। খোঁড়াতে খোঁড়াতেই পাহাড় বেয়ে উঠে যেতে থাকল সে। তাড়াতাড়ি বোল্ট টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে ভালমত নিশানা করলেন তিনি। বাঘটা পাহাড়ের ওপরে উঠে যাওয়ায় শুয়ে শুয়েই এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ওটাকে। আস্তে করে ট্রিগার টিপতেই হ্যামার পড়ল

খালি চেম্বারে, গুলি ফুরিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ালেন করবেট। নেই। মাত্র পাঁচটা বুলেট নিয়েই বেরিয়েছিলেন তিনি। বাকিগুলো রয়ে গেছে সুটকেসেই। অতএব করবেটকে বোকা বানিয়ে রেখে ধীরেসুস্থে পাহাড়ের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল বাঘটা।

মৃত অবস্থায়ই পাওয়া গেল আগের গুলি-খাওয়া বাঘ দুটোকে। আসলে দুটোরই অল্প বয়স, যেটা চলে গেছে সেটা ওদের মা। বাচ্চা দুটোর বয়স দেখে হঠাৎ একটা সন্দেহ ঢুকল করবেটের মনে, তুকার মানুষখেকো মারতে গিয়ে পাইনের বনে যে দুটো বাঘের বাচ্চাকে মায়ের কাছ থেকে ট্রেনিং নিতে দেখেছিলেন তিনি, এরা ওই দুটোই নয়তো? অল্পক্ষণের মধ্যেই দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গাঁয়ের লোকেরা পৌঁছে গেল, মাধো সিংও আছে ওদের মাঝে। করবেট গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে আসার একটু পরই মাধো সিং-এর দল তল্লাকোট এসে পৌঁছেচে।

বুদ্ধি করে করবেটের সুটকেস থেকে কিছু তাজা বুলেটও নিয়ে এসেছে মাধো সিং। গাঁয়ের লোকদেরকে বাঘ দুটোর গতি করার নির্দেশ দিয়ে বেশ কিছু তাজা বুলেট সাথে করে বাঘিনীর খোঁজে চললেন করবেট।

পাথরের টিলার কাছে, যেখানে গড়িয়ে গিয়ে পড়েছিল বাঘটা সেখানে রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। তারপরই ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ রেখে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠে গেছে বাঘিনী। পাহাড়ের ওপাশে লম্বা ঘাসের জঙ্গলে এসে

তার আর কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। অতএব জঙ্গলে খোঁজার কাজ আগামী দিনের জন্যে স্থগিত রেখে ফিরে এলেন তিনি।

এসে দেখলেন বাঘের বাচ্চা দুটোর ছাল ছাড়াতে শুরু করে দিয়েছে তাঁর লোকেরা। সেটা দেখতে দেখতে তাঁর হাত থেকে রহস্যময় ভাবে বাঘিনীটার বেঁচে যাওয়ার কারণগুলো ভাবতে লাগলেন তিনি। ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন:

* কাঁধের হাড়ে গুলি খাওয়ার পরপরই নরম মাথাওয়ালা ২০৫ বুলেটের প্রচণ্ড ঝটকা আর ব্যথায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে বাঘিনী।

* চারাগাছে পেট ঠেকিয়ে আটকে যায় ওটা। শ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে ওঠা নামা করতে থাকে বুক, সেই সাথে পেটও। এই ওঠা নামার ফলেই একচুল একচুল করে সরতে সরতে ভারসাম্য হারিয়ে সে চারাগাছ থেকে পিছলে বেরিয়ে আসে। এবং গড়াতে থাকা অবস্থায়ই আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে পায় আবার।

* শুধু পালাবার তাগিদেই অনির্দিষ্ট ভাবে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করে বাঘিনী। হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে উঠতে না পারায় বিপদের মাত্রা পরিমাপ করতে পারেনি তখনও। তাই দ্রুত পালিয়ে না গিয়ে ধীরেসুস্থে পাহাড় বেয়ে উঠছিল সে।

*

জঙ্গল খেদানো শুরু হল পরদিন দুপুরে। পাহাড়ের মাথায় চড়ে বসে থাকলেন করবেট। নিচ থেকে ঘাসের জঙ্গলে খেদিয়ে খেদিয়ে ক্রমেই ওপরের দিকে উঠে আসতে থাকল খেদানো দল। তাড়া খেয়ে ওপরের দিকে উঠে আসবে বাঘিনী, তখন গুলি করলে দুর্ভাগ্যক্রমে নিচের লোকদের গায়ে গুলি লেগে যাবার আশঙ্কা আছে, কিন্তু ঘাসের জঙ্গল থেকে তাকে বের করে আনতে হলে এ ছাড়া উপায়ও নেই। তাড়া খেয়ে ঘাসের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটা কাকর আর কয়েকটা কালেগে পাখী, কিন্তু বাঘিনী এল না। আসলে নেই সে এখানে।

খেদানো দলটাকে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে বাঘিনী কোথায় আর কোন্‌দিকে গেছে খুঁজতে শুরু করলেন করবেট। পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগের সাথে দেখতে শুরু করলেন চারপাশটা। বিস্তৃত পাহাড়টার বাঁয়ের উপত্যকাতেই মেয়েলোকটিকে মেরেছিল বাঘিনী। উপত্যকাটার ডান প্রান্তে গাছ আর আগাছার ঘন জঙ্গল, বাঁ প্রান্ত থেকে জমিটা খাড়া নেমে গিয়ে শেষ হয়েছে বিশাল এক পাথরের স্তূপের গোড়ায়। আহত পা নিয়ে পাহাড় বেয়ে ওঠার চেয়ে নামা কষ্টকর। মাথাটা পরিষ্কার হওয়ার পর আঘাত সামলাবার জন্যে প্রথমে একটা আশ্রয়স্থল খুঁজে নেবে বাঘিনী। কিন্তু কথা হচ্ছে কোথায় যেতে পারে সে? পাহাড়ের গায়ে জন্তু জানোয়ার চলার বহু পথ আছে, কিন্তু

তার সবগুলিই কঠিন পাথুরে মাটিতে ঢাকা। মাংসের প্যাড লাগানো পাওয়ালা জানোয়ারের পায়ের ছাপ কিছুতেই পড়বে না এখানে। পাহাড়ের মাথায়ও বুনো জানোয়ার চলার একটা ভাল পথ আছে। পথটার বাঁয়ে ঢালু ঘাস জমি। আর ডানের পাথরের চাতাল গিয়ে পৌঁছেচে খাদের এদিকের প্রান্তে। খাদের ওদিকের প্রান্তের কাছ দিয়েই বয়ে গেছে গভীর নালা। ভেবে চিন্তে এ পথটা ধরেই রওনা দিলেন তিনি।

পাহাড়ের ওপরের পথ ধরে মাইলখানেক এগোনোর পর এক জায়গায় অপেক্ষাকৃত নরম মাটিতে বাঘিনীর পায়ের দাগ চোখে পড়ল, পাশে আবছা রক্তের চিহ্নও আছে। গত কাল বিকেলে ঘাসের জঙ্গলে কিছুক্ষণ ঘাপটি মেরে বসে থেকে গুলিয়ে যাওয়া মাথাটা পরিষ্কার করে নিয়েছে বাঘিনী, তারপর পাহাড় ঘুরে পথের এখানে এসে উঠেছে। আর্ধ মাইল পর্যন্ত তার পায়ের দাগ ধরে এগোলেন করবেট। পাহাড়ের ডানের চাতালটা এখানে সরু হতে হতে পনের ফুটে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্ভবত চাতাল বেয়ে নেমে নালার ওপারের ঘন জঙ্গলে আশ্রয় নিতে চেয়েছিল বাঘিনী। কিন্তু আহত পায়ের জন্যে অথবা রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে গজ দু'য়েক এগিয়েই পিছলে নিচের নালায় পড়ে যায় সে। অবশ্য সুস্থ অবস্থায় পড়ে গেলেও দোষ দেয়া যেত না বাঘিনীকে, কারণ চাতালটা অত্যন্ত খাড়াই। আর এ চাতাল বেয়ে নামা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাই কয়েকশো গজ দূরের

একটা ফাটল বেয়ে নেমে গিয়ে চাতালের নিচে নালার কাছে পৌঁছুলেন করবেট। নিচে দাঁড়িয়ে আন্দাজ করলেন নালা থেকে চাতালের উচ্চতা কম করে হলেও সত্তর আশি ফুটের মত হবে। অত উঁচু থেকে বাঘিনীর মত ভারি জানোয়ার পড়ে গেলে তার মৃত্যু অবধারিত। মরা বাঘিনীর খোঁজে এদিক ওদিক তাকালেন তিনি। একটু পরই তাঁর চোখে পড়ল একটা জানোয়ার, পেটের সাদাটে অংশটা এদিকে করে পড়ে আছে ওটা।

অতি সাবধানে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন করবেট জানোয়ারটার দিকে। বলা যায় না, গুরুতর আহত হয়েও পড়ে থাকতে পারে ওটা। মাত্র কয়েক গজ এগিয়েই সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হতে হল তাঁকে। আহত হয়নি, মারাই গেছে জানোয়ারটা — একটা বেশ বড় আকারের শম্বর। নিশ্চয়ই পাহাড়ের ওপরের সরু চাতালে শুয়ে ছিল শম্বরটা, বাঘিনীর সাড়া পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় নিচে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল সে, কিন্তু পারেনি। পাথরের ওপর পড়ে ঘাড় ভেঙে গেছে ওটার। শম্বরটা লাফিয়ে পড়ায় তার আশপাশের বালি আলগা হয়ে যায়। সেই আলগা বালির ওপরই লাফিয়ে নেমেছে বাঘিনী। অত উঁচু থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে কাঁধে নিশ্চয়ই জোর আঘাত পেয়েছিল সে। এর ফলে কাঁধের ক্ষতটা থেকে আবার রক্ত ঝরতে শুরু করে। এখান থেকে ভালমতই রক্তের চিহ্ন রেখে গেছে বাঘিনী। রক্তের দাগ ধরে ধরে কয়েক

গজ এগিয়েই নালা পার হয়ে ডানে চলে গেছে সে। চিহ্ন দেখেই বোঝা গেল, নালার মাত্র দু'ফুট উঁচু পাড়টা বেয়ে উঠতেই বহু কসরৎ করতে হয়েছে তাকে। নিশ্চিত হলেন করবেট, শরীরের এ অবস্থা নিয়ে বেশিদূর যেতে পারেনি বাঘিনী। হয়তো এর পরের প্রথম ঝোপ বা খাদটাতেই পাওয়া যাবে তাকে। অনেকক্ষণ থেকেই মাথার ওপর মেঘ জমতে শুরু করেছিল। করবেট নালাটা পেরোতেই প্রথমে বড় বড় ফোঁটায় তারপর মুষলধারে নেমে এল প্রচণ্ড বৃষ্টি। পানির তোড়ে ধুয়ে গেল রক্তের দাগ। বিকেল গড়িয়ে গেছে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সন্ধ্যা নামবে বৃষ্টির দিনে। অতএব ক্যাম্পে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই তাঁর।

শম্বরের মাংস খেতে অত্যন্ত ভালবাসে কুমায়ুনের লোকেরা। করবেটের কাছে খবর শুনে পরদিন সকালেই শম্বরটাকে আনার জন্য লোক পাঠান হল, করবেটও চললেন ওদের সাথে। আগের দিন যেখান থেকে ফিরে গিয়েছিলেন তিনি সেখান থেকে নালার ডান পাড় ধরে কিছুটা এগিয়েই দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে নালাটা। প্রথমটা ধরে শ'খানেক গজ এগিয়েই ফিরে এলেন করবেট। কারণ এরপর এত খাড়া হয়ে নেমে এসেছে নালাটা যে ওটার পাড় ধরে ওই আহত বাঘিনী তো দূরের কথা, সম্পূর্ণ সুস্থ বাঘও উঠতে পারবে না। ফিরে এসে চেঁচিয়ে তার লোকজনদের চা করতে বলে দ্বিতীয় নালাটা ধরে এগোলেন তিনি। কিছুদূর এগিয়েই চোখে পড়ল ঢালু পাহাড় বেয়ে নেমে এসেছে

বুনো জানোয়ার চলার পথ। পথের ওপর বাঘিনীর আবছা পায়ের ছাপও চোখে পড়ল তাঁর। আরো এগিয়ে একটা পাথরের কাছে পৌঁছে দেখলেন তিনি। পাথরটার ওপাশের নরম মাটিতে গভীর ভাবে বসে গেছে বাঘিনীর পায়ের ছাপ। বেশ খানিকটা রক্তও লেগে আছে মাটিতে পড়ে থাকা পাতার গায়ে।

মাত্র কয়েক মিনিট আগে ছিল এখানে বাঘিনী। আহত মানুষখেকো বাঘিনীকে এভাবে পায়ে হেঁটে অনুসরণ করা অনুচিত। পেছন থেকে বা মাথার ওপরে গাছে বসে বাঘিনীর গতিবিধি বলে দেওয়ার জন্যে অন্ততঃ কাউকে এখন দরকার। যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন সেখানে ফিরে এসে দেখলেন করবেট, শম্বরটার ছাল ছাড়ানো শেষ, আর চা তৈরি করে অপেক্ষা করছে তাঁর লোকেরা। এক কাপ চা খেয়ে লোকজনদের সহ আবার পাথরটার কাছে ফিরে গেলেন করবেট। পাথরটার কাছে রক্ত পড়ে থাকতে দেখে মাধো সিং মন্তব্য করল, বেশ ভালমতই আহত হয়েছে বাঘিনীটা।

খাড়া পাহাড় বরাবর এখানে চলে গেছে একটা সরু নালা। নালার ডানে পাহাড়ের ঢালে গভীর জঙ্গল, নিচটায় আগাছা তেমন নেই। বাঁ পাড়ে রিঙ্গল ঝোপ, অন্যান্য আগাছাও আছে প্রচুর। ডান দিকের সবচেয়ে উঁচু গাছটায় তাঁর লোকজনকে চড়ে বসতে বললেন করবেট। সন্দেহজনক কিছু ওদের চোখে পড়লে চাপা শিস দিয়ে তাঁকে

হুঁশিয়ার করে দেবে ওরা।

লোকগুলো গাছে চড়ে বসতেই রক্তের দাগ ধরে এগোতে শুরু করলেন করবেট। পাথরটার কাছ থেকে উঠে দাঁড়ানর পর নিশ্চয়ই রক্ত ঝরা কমে এসেছিল, তাই এখানে ওখানে খুব সামান্য রক্তের দাগ রেখে গেছে বাঘিনী। চলার পথে হয়তো অনেকদূর পর্যন্ত রক্তের কোন চিহ্নই নেই, তখন তার পায়ের দাগ অথবা পায়ের চাপে চেপ্টে যাওয়া ঘাস পাতার নমুনা দেখে এগোতে হচ্ছে তাঁকে। যত সময় যাচ্ছে, ততই সুবিধে হচ্ছে বাঘিনীর। ক্রমেই আঘাত কাটিয়ে উঠতে পারছে সে। এদিকে অবস্থা ক্রমশ কাহিল হয়ে পড়ছে করবেটের। এ কয়দিন তেমন টের পাওয়া যায়নি, কিন্তু সেদিন সকাল থেকে কানের ভেতরের যন্ত্রণাটা আবার বাড়তে শুরু করেছে।

চলতে চলতে একটু পরই বিস্তৃত পাতাবাহারের ঝোপের কাছে এসে হাজির হলেন করবেট। তারপর প্রায় একশ গজ পর্যন্ত হাঁটু পরিমাণ উঁচু পাতাবাহারের জঙ্গল সোজা পেরিয়ে রিঙ্গল ঝোপের কাছে পৌঁছুলেন তিনি। কেন যেন তাঁর মনে হল, এই ঝোপের ভেতরই শুয়ে আছে বাঘিনীটা। ইচ্ছে করে দেখা না দিলে এখানে তাকে খুঁজে পাওয়াও যাবে না। রিঙ্গলের পরস্পর জড়িয়ে থাকা ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তবুও যতদূর সম্ভব কম শব্দ করে এগিয়ে ঝোপটা অর্ধেক পেরোতেই কাকরের ডাক শুনতে পেলেন করবেট। আবার

চলতে শুরু করেছে বাঘিনী। তবে এবার সে পাহাড় বেয়ে সোজা না উঠে বাঁয়ে মোড় নিয়ে খোলা জায়গার দিকে এগোচ্ছে। ওদিক থেকেই শোনা গেছে কাকরের ডাক। আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেই আবার ডাকতে শুরু করল কাকরটা। একটু পরই থেমে গেল কাকরের ডাক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একসাথে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকটা কালেগে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বাঁয়ে ঘুরলেন করবেট।

বাঁ কানের পর্দাটা ফেটে যাওয়ায় ঠিক কোন্ জায়গা থেকে কাকরটা ডেকেছিল ঠাহর করতে পারলেন না তিনি। তবে কালেগেগুলো যেদিক নির্দেশ করছে সে-জায়গাটায় চোখ রাখতে হলে একটু আগে পেরিয়ে আসা পাতাবাহারের জঙ্গলে ফিরে আসতে হবে তাঁকে। করবেট পাতাবাহারের জঙ্গলে ফিরে আসতে না আসতেই জীবন্ত হয়ে উঠল আশ-পাশের এলাকা। ক্রমাগত ডাকতে শুরু করেছে শম্বর, কাকর আর বানরের দল। তিনি না দেখলেও ওরা ঠিকই দেখতে পাচ্ছে বাঘিনীকে। তবে সেই মুহূর্তে করবেটের সবচেয়ে উপকার করল কতগুলো পাখী। বাঘ দেখলেই তার পিছু নেয় এরা। ঝোপের ভেতরের বাঘটাকে অনুসরণ করে ডাকতে ডাকতে উড়ে চলেছে পাখীগুলো। নিশ্চিন্তে ওদেরকে অনুসরণ করে চললেন করবেট।

কখনো পাহাড় বেয়ে সোজা উঠে যাচ্ছে বাঘিনী, কখনো এগিয়ে যাচ্ছে এঁকে বেঁকে। পাহাড়ের মাথায় এক জায়গায় শ'খানেক গজ জুড়ে জমে আছে ছোট ছোট শক্ত ঘাস। তার ওপারেই ঘন আগাছার দুটো বিশাল ঝোপ। ঝোপের

মধ্যে দিয়ে গিয়ে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছে একটা সরু পথ। ঘাস জমিটার কাছাকাছি গিয়েই বোধহয় বাঘকে বাসার কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ভেবে ফিরে এল পাখীগুলো। অনুসরণের নিশ্চিত উপায়টা হারালেন করবেট। বাঘিনীর পায়ের দাগ ধরে এগোতে হলে আবার চোখ কান খোলা রাখতে হবে তাঁকে।

তাকে যে অনুসরণ করা হচ্ছে এটা টের পেয়ে গেছে বাঘিনী, তাই অত্যন্ত হুঁশিয়ার হয়ে ঝোপের আড়ালে আড়ালে এগোচ্ছে সে। কোন্দিক দিয়ে যাচ্ছে বাঘিনী টের পেলেও তাকে দেখতে পাচ্ছেন না করবেট। কিছুক্ষণ পর কোন্ দিক দিয়ে সে যাচ্ছে সেটাও আর ঠাহর করতে পারা গেল না। ডানের আগাছার জঙ্গল করবেটের বাঁয়ের-টার তুলনায় কাছে। প্রথমে সেটা ধরেই এগোনো ঠিক করলেন তিনি। জঙ্গলটা আর মাত্র দু'গজ দূরে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালেন করবেট। ভারি জানোয়ারের পায়ের চাপে শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ। বেশ কিছুটা পিছিয়ে এসে শব্দটা কোন্দিক থেকে এসেছে ঠাহর করার চেষ্টা করলেন তিনি। জায়গাটা আন্দাজ করে নিয়ে পা টিপে টিপে এগোলেন সেদিকে, এবং ভুল করলেন। বাঁ কানটা ভাল না থাকায় ভুল জায়গা নির্ধারণ করেছেন তিনি। গাছের ওপর বসে বাঘটাকে লক্ষ্য করছিল করবেটের লোকেরা, সেই সাথে তাঁকেও। যখন দেখল ভুল পথে এগোচ্ছেন তিনি, শিস দিয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল তারা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে করবেট ওদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়াতেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে, বুঝল ওরা। বাঘিনী কোন্‌দিকে গেছে তা ওরা হাত নেড়ে ইঙ্গিত করে জানাল করবেটকে। পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে ওপাশে চলে গেছে বাঘিনী। যত দ্রুত সম্ভব সরু পথটা ধরে পাহাড়ের মাথায় উঠে এসে ওপাশে তাকালেন করবেট। সামনেই একটুকরো খোলা জমি। চাষ করার আগে আগুন লাগিয়ে জমির শুকনো ঘাস পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। সারাটা জমিতেই বিছিয়ে আছে পোড়া ঘাসের ছাই। গতকালের বৃষ্টিতে সেই ছাই ভিজে গিয়ে মাটির ওপর আলগা ভাবে মিশে আছে। এর ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে পায়ের ছাপ পড়বেই। বাঘিনীটার পায়ের ছাপও পড়েছে। ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে একটা ছোট্ট নদীর দিকে নেমে গেছে পাহাড়টা। অল্পক্ষণ নদীর পাড়ে শুয়ে থেকে নদী পেরিয়ে ওপারের ঘন জঙ্গলে ঢুকে গেছে বাঘিনী। ওকে আর এখন অনুসরণ করার কোন মানে হয় না। বাধ্য হয়ে সেদিনও ফিরে আসতে হলো করবেটকে।

পরদিন বাঘের বাচ্চা দুটোর চামড়ায় লবণ মাখিয়ে শুকানোর বন্দোবস্ত করতে করতেই কেটে গেল সকাল বেলাটা। দুপুরে চারজন লোক সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন করবেট। আগের দিন যে পাহাড়টার মাথা থেকে ফিরে গিয়েছিলেন, হাঁটতে হাঁটতে সেখানেই চলে এলেন তিনি। পাহাড়ের মাথা থেকে বাঁ দিকের উপত্যকার অনেকখানিই

চোখে পড়ে। তবুও পাহাড়ের মাথার একটা বড় গাছে লোকগুলোকে তুলে দিয়ে ভালমত পরীক্ষা করিয়ে নিলেন চারপাশটা। সন্দেহজনক কিছু দেখা যাচ্ছে না, কথাটা ওরা জানাতেই যেখান দিয়ে গতকাল নদী পেরিয়েছিল বাঘিনী সেখানে চলে এলেন করবেট।

আহত হওয়ার পর চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেলেই অনুসরণকারীর ওপর বাঘের আক্রমণের সম্ভাবনা সাধারণত অনেকখানি কমে যায়। তবে এ কথা সব বাঘের বেলায় খাটে না। এক এক বাঘের মেজাজ মর্জি এক এক রকম। তাছাড়া ভীষণ ক্ষুধার্ত এখন বাঘিনী। বাচ্চাদের সাথে বসে মেয়েলোকটাকে খাবার পর আজ পাঁচদিন পর্যন্ত তার পেটে কিছুই পড়েনি। এমনিতেই ক্ষুধার্ত বাঘ অত্যন্ত বিপজ্জনক। আর সে মানুষখেকো হলে তো কথাই নেই। সুতরাং চোখ কান ভালরকম সজাগ রেখে এখন পথ চলতে হবে করবেটকে। ওদিকে আরও বেড়ে গেছে তাঁর কানের যন্ত্রণা।

যেখান দিয়ে নদী পার হয়েছে বাঘিনী সেখানটা তিন ফুট চওড়া আর দু'ফুট গভীর। নদী পেরিয়ে বাঘিনীর পায়ের ছাপ অনুসরণ করে গরু মহিষ চলাচলের একটা পথের ওপর এসে দাঁড়ালেন করবেট। রাস্তাটা থেকে গজ তিরিশেক দূরে ঘন পাতাওয়ালা একটা গাছের নিচে সারারাত শুয়ে ছিল বাঘিনী। এখানে কোন রক্তের দাগ চোখে পড়ল না। ঘুম থেকে উঠে গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গেছে সে। বিকেল পর্যন্ত কয়েক মাইল পথ অনুসরণ করে

ফিরে এলেন করবেট।

পরদিন ১১ই এপ্রিল। সকাল বেলা রাইফেল হাতে একাই বেরিয়ে পড়লেন করবেট। আগের দিন যে জায়গা থেকে ফিরে এসেছিলেন, তারপর থেকে এগোতে থাকলেন। পায়ে হেঁটে মানুষখেকো শিকারের সময় সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থা হলো পেছন থেকে আক্রান্ত হওয়া। দু'পাশ থেকে আক্রান্ত হলেও বিপদের পরিমাণ অনেকাংশে কম থাকে। মানুষখেকো বাঘ সাধারণত একলাফে যতদূর পেরোতে পারে ততটা দূর থেকেই আক্রমণ করে। কিন্তু আহত হলে তার কোন নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকে না, দশ, বিশ, এমন কি একশ গজ দূর থেকেও তখন আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রথম ক্ষেত্রেই অবশ্য বিপদ বেশি, কারণ তাতে সময় পাওয়া যায় কম। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই সমান ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন। আক্রান্ত হবার সাথে সাথে রাইফেল তুলে ট্রিগার টিপতে হবে। সময়ের একটু হেরফের বা চরম মুহূর্তে রাইফেলের মেকানিজম অকেজো হয়ে গেলে একটা পরিণতিই ঘটবে—শিকারীর মৃত্যু।

বড় বড় পাথরের চাঁই, ঝোপঝাড়—এমন কিছু কিছু জিনিস যার পেছনে ওৎ পেতে বসে থাকতে পারে বাঘিনী, সব এড়িয়ে চলতে লাগলেন করবেট। আগের দিন বিকেলে টনকপুরের রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়েছে বাঘিনী। গত রাতে শুকনো ঘাসের ওপর শুয়ে রাত কাটিয়েছে সে। এখান থেকে ঝোপঝাড় এড়িয়ে যতটা সম্ভব খোলা জায়গা দিয়েই

এগিয়েছে। বার বার নালার কাছ ধরে আর গরু মোষ চলার পথ ধরে বাঘিনীর এগোনো দেখে বোঝা যায় কোন জানোয়ার মেরে খাবার চেষ্টা করছে সে। একটু পরই নালার ধারে মৃত্যুর চিহ্ন পাওয়া গেল। কয়েক সপ্তাহের একটা হরিণ-ছানা বালির চড়ায় শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিল, বোধহয়, সেটাকেই ধরে খেয়েছে বাঘিনী। ছানাটার খুর-গুলো ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি সে। বোঝা গেল বাঘিনীর কাছ থেকে বড়জোর মিনিট দু'য়েকের পথ পেছনে আছেন করবেট। ওই খুদে হরিণ ছানা খেয়ে বাঘিনীর খিদে না মিটে বরং বেড়ে যাবার কথা। সুতরাং আরও সাবধান হয়ে গেলেন করবেট। ঝোপঝাড় আর পাথরের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে এখানকার নালা আর বুনো জানোয়ার চলার পথগুলো। শরীর ভাল থাকলে এখন সহজেই ধরে ফেলতে পারতেন করবেট বাঘিনীকে। কিন্তু ফোঁড়ার ব্যথায় মুখ ফুলে গেছে তাঁর। ঘাড়টা এমন ফুলেছে যে মাথাটা এপাশ-ওপাশ, ওপর-নিচে কোন-দিকেই নাড়াতে পারছেন না। মেলতে পারছেন না বাঁ চোখের পাতা। শুধু ডান চোখেই যা কিছু দেখতে পাচ্ছেন এখন।

এ অবস্থা নিয়েই সারাদিন অনুসরণ করলেন তিনি বাঘিনীকে। যেখানেই নালাটা বা পথটা গভীর ঝোপের মধ্যে দিয়ে গেছে সেখানেই তা এড়িয়ে গিয়ে ঘুরে উল্টো দিকে এসে বাঘিনীর পায়ের দাগ খুঁজে নিতে লাগলেন। টনকপুরের রাস্তা ছেড়ে ক্রমশঃ এখন তল্লাকোটের দিকে

চলতে শুরু করেছে বাঘিনী। এ পর্যন্ত দেখেই গ্রামে ফিরে এলেন করবেট।

শরীরের শিরায় শিরায় এখন ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা। যন্ত্রণাটা একটু ভুলে থাকার জন্যে বসে বসে কাপের পর কাপ শুধু চা খেতে থাকলেন করবেট। ক্রমেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন তিনি। ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে তাঁর শরীরে, হয়তো আজ রাতেই, ব্যাপারটা আঁচ করতে পারছেন। এদেশের লোককে মানুষখেকোর হাত থেকে বাঁচাতে এসে ওদের বিপদ বরং বাড়িয়েই দিয়েছেন করবেট, ভেবে প্রচণ্ড দুঃখ হচ্ছে তাঁর। গুলিতে আহত হয়ে আরও চালাক আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে বাঘিনী, শত গুণ বেড়ে যাবে এ অঞ্চলের লোকেদের বিপদের পরিমাণ। সুতরাং বাঘিনীর সাথে একটা শেষ বোঝাপড়া করতেই হবে, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন করবেট এবং আজ রাতেই তা না পারলে, পরিষ্কার বুঝতে পারছেন তিনি, কাজটা করার জন্যে আগামী-কাল আর নাও বেঁচে থাকতে পারেন তিনি। কারণ ফোঁড়াটা ফেটে যাবার পর পূঁজ-রক্ত বাইরে না বেরিয়ে মস্তিষ্কের দিকে চলে গেলেই শেষ হয়ে যাবেন করবেট, কথাটা জানা আছে তাঁর।

মন স্থির করে নিয়ে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এলেন তিনি তাঁবু থেকে। চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়ী কায়দায় তৈরি শেষ কাপ চা খেয়ে সঙ্গে আসা লোকজনদের ডেকে ভালমত বুঝিয়ে বললেন, পরদিন বিকেল পর্যন্ত যেন

তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে তারা। ওই সময় পর্যন্ত করবেট না ফিরলে ওদেরকে ভাবতে হবে আর কখনও ওদের মাঝে ফিরে আসবেন না তিনি। তার পরদিনই যেন জিনিসপত্র গুছিয়ে নৈনিতাল ফিরে যায় ওরা। একটি কথাও না বলে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করবেটের কথা শুনছিল তাঁর লোকেরা। কথা শেষ করে গায়ের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়েই ঘুরে দাঁড়ালেন করবেট, লম্বা লম্বা পা ফেলে নেমে যেতে থাকলেন উপত্যকার দিকে। কয়েক পা এগিয়ে একবার ফিরে তাকালেন। যেমনি অবস্থায় লোকগুলোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, এখনও ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছে ওরা। একটা পরিবর্তন শুধু লক্ষ্য করলেন করবেট, ওদের কারও কারও দু' গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কোন তরল পদার্থ। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় চকচক করছে তা। কাঁদছে লোকগুলো।

উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় পথ দেখে দেখে ক্রমশঃ এগিয়ে চললেন করবেট মৃত্যুর দিকে। যতক্ষণ জ্ঞান আছে ততক্ষণ মানুষখেকোকে বিন্দুমাত্র ভয় করেন না তিনি, কিন্তু জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেই সব শেষ। যেখান থেকে বাঘিনীর পায়ের দাগ অনুসরণ করা ছেড়ে এসেছিলেন তিনি সেখানে পৌঁছেই আবার অনুসরণ করতে শুরু করলেন। বাঘিনীটা বুনো পথ থেকে নেমে যায়নি বলে তাকে অনুসরণ করতে খুব বেশি কষ্ট হল না। তাছাড়া শম্বর আর কাকরগুলোও মাঝে মাঝেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে করবেটকে। চলতে

চলতে একসময় বিশাল একটা ওক গাছের নিচে এসে থামলেন তিনি। গাছের ওপর অসংখ্য ছায়ার নড়াচড়া দেখে বুঝলেন, ওগুলো বানর। গত আঠার ঘণ্টা ধরে (শুধু ক্যাম্পে ফিরে বিশ্রামের সময়টুকু ছাড়া) একটানা হেঁটেছেন তিনি। তাই গাছটার নিচে কিছুক্ষণ বসে একটু জিরিয়ে নেবার প্রয়োজন বোধ করলেন এখন। বিপদ দেখলে গাছের ওপর থেকে হুঁশিয়ারী জানাবে বানরেরা, অতএব ভয় নেই। সামনের ঝোপটার দিকে মুখ করে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেন করবেট। আধ ঘণ্টা পর প্রথম হুঁশিয়ারী জানাল একটা বুড়ো বানর। বাঘিনীটা শুয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ওকে দেখতে পেলেন করবেট। তাঁর কাছ থেকে একশ গজ ডাইনে একটা ঝোপের গজ দশেক দূরে মাটিতে শুয়ে পড়ে মুখ তুলে বানরটার দিকে চেয়ে আছে বাঘিনী।

শরীর সুস্থ থাকলে পরিষ্কার জ্যোৎস্নার আলোয় একশ গজ দূরের যে কোন বড় জানোয়ারকে সহজেই গুলি বিদ্ধ করতে পারেন করবেট। কিন্তু এখন ঝুঁকিটা নেয়া ঠিক হবে না, ভাবলেন তিনি। আগের দু'রাত একই জায়গায় শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়েছিল বাঘিনী, আজও তাই করতে পারে ভেবে চুপ করে থাকলেন করবেট। বাঘিনী ঘুমিয়ে পড়লে বুনো পথ ধরে তার কাছের ঝোপটায় পৌঁছে যেতে পারবেন তিনি। তারপর দশ গজ দূরের বাঘিনীকে গুলি করা শরীরের এই অবস্থায়ও তাঁর পক্ষে কঠিন হবে না।

আধ ঘণ্টা বা তারও কিছু বেশি সময় একভাবে শুয়ে থেকেই এদিক ওদিক মাথা নাড়াতে থাকল বাঘিনী। ও-দিকে ঘুম জড়িত গলায় একটানা ডেকেই চলল বানরটা। শেষ পর্যন্ত বোধহয় বানরটার ওপর বিরক্ত হয়েই উঠে দাঁড়াল বাঘিনী। একমুহূর্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে করবেটকে ডানে রেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করল সে। ওদিকটায় প্রায় পনের ফুট গভীর আর পঁচিশ গজ চওড়া একটা নালা আছে। বাঘিনী আর করবেটের মাঝের দূরত্ব একশ পঞ্চাশ গজে পৌঁছতেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ওর চেয়ে করবেটের চলার গতি এখন দ্রুত। বাঘিনী নালার ধারে পৌঁছতে পৌঁছতে দুজনের দূরত্ব পঞ্চাশ গজে এসে ঠেকল। গুলি করা যায় এখন। রাইফেল তুলে নিশানা করছেন করবেট, হঠাৎ সামান্য একটু সরে একটা গাছের ছায়ার নিচে চলে গেল বাঘিনী। অনেকক্ষণ এক ভাবে ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে থাকার পর বেরিয়ে এসে নালার পাড়ে দাঁড়াল সে। নালাটা পার হতে যাচ্ছে এখন বাঘিনী। বাঘিনী নালাতে নামলে গুলি করবেন ভেবে মাথা নিচু করে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন করবেট। কয়েক গজ গিয়েই টের পেলেন একটা পরিবর্তন আসছে কানের ব্যথায়। ঘোলা হয়ে আসছে চোখের দৃষ্টি। তবে কি শেষ সময় উপস্থিত? কাছেই দুটো ওকের চারা নজরে পড়ল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে রাইফেলটা গাছের গোড়ায় রেখে গাছ বেয়ে উঠে গেলেন করবেট ওপরে। দশ বারো ফুট উঠেই বসার

মত একটা ভাল ডাল পেয়ে গেলেন। এই ডালটায় বসে, পেছনের একটা ডালে পিঠ ঠেকিয়ে নিচের আরেকটা ছোট ডালে পা রেখে যতদূর সম্ভব আরাম করে বসলেন তিনি, চোখের সামনের ডালটা দু'হাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে মাথাটা রাখলেন তার ওপর। সেই মুহূর্তে গড়িয়ে গড়িয়ে রক্ত আর পুঁজ বেরিয়ে এল করবেটের বাঁ কান দিয়ে, সাথে সাথেই কমে গেল ব্যথাটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন করবেট। মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেনি রক্ত। মাঝ রাতের দিকে একেবারে কমে গেল ব্যথা। কিন্তু মাথাটা ডাল থেকে না তুলে সেভাবেই বসে থাকলেন তিনি বাকি রাতটা।

পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসতেই সোজা হয়ে বসলেন করবেট। অনেকখানি কমে গেছে ব্যথা, মুখ আর ঘাড়ের ফোলা, যে দিকে খুশি ইচ্ছে মত মাথা ঘোরাতে পারছেন এখন তিনি। খুলে গেছে বাঁ চোখের পাতা। বাঘিনীকে গুলি করার আর একটা মোক্ষম সুযোগ হারিয়েছেন বটে, কিন্তু কিচ্ছু এসে যায় না তাতে। সুস্থ হয়ে গেছেন করবেট। তাঁর হাত থেকে বেশিক্ষণ আর পালিয়ে বাঁচতে পারবে না বাঘিনী।

যে চারা গাছ বেয়ে বহু কষ্টে উঠেছিলেন করবেট, সেটা থেকেই একলাফে নেমে এলেন এখন। রাইফেলটা তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন নালার কাছে। পানিতে নেমে নিজেকে আর পরনের কাপড়গুলোকে ধুয়ে নিলেন যতটা সম্ভব। তারপর রওনা দিলেন গ্রামের দিকে।

ক্যাম্পে পৌঁছে শুনলেন করবেট, তিনি বিদায় নেবার পর সারাটা রাত ঘুমায়নি তাঁর লোকেরা, আগুন জ্বালিয়ে চায়ের পানি গরম করতে করতে তাঁর আসার প্রতীক্ষা করেছে সারাক্ষণ। তাঁকে আসতে দেখেই খুশিতে চেঁচিয়ে উঠে নাচতে শুরু করল ওরা, আর তিনি ভাল হয়ে গেছেন শুনে তো জয় জয়কার পড়ে গেল ভগবানের। করবেটকে জোর করে গ্রামে নিয়ে গেল ওরা। তাঁর থাকার জন্যে দুটো ঘর ছেড়ে দিল মোড়ল। অসহ্য যাতনার পর হঠাৎ আরাম পাওয়ায় দু'চোখ জুড়ে রাজ্যের ঘুম নেমে আসছে করবেটের। বিছানায় শুয়ে টের পেলেন তিনি, জুতো খুলে নিয়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হচ্ছে তাঁকে।

ঘরের ভেতর কাদের কথার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল করবেটের। ঘুম ভাঙার পর একজন লোককে বলতে শুনলেন, 'জাগাতেই হবে সাহেবকে। নয়তো পরে ঘুম থেকে উঠে কথাটা শুনলে ভীষণ রাগ করবেন তিনি।

কথার উত্তর দিল একজন. 'মরে গেলেও ঘুম থেকে এখন তুলছি না আমি তাঁকে।' উত্তরটা গঙ্গারামের।

উঠে বসে কি হয়েছে জানতে চাইলেন করবেট। ওরা জানাল গ্রামের উল্টো দিকে এক জায়গায় ছ'টা ছাগলকে বাঘে মেরে ফেলেছে। মানুষখেকোটার কাজ। এত তাড়াতাড়িই প্রতিশোধ নিতে শুরু করে দিয়েছে তাহলে সে, ভাবলেন করবেট। তাড়াতাড়ি জুতো মোজা পরে নিলেন। ঘরের বাইরে ততক্ষণে বহু লোক এসে ভিড় জমিয়েছে। দুঙ্গার

সিংকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন করবেট। ঘুম থেকে উঠে শরীরটা বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছে তাঁর। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারছেন তিনি। যে উপত্যকায় আহত করেছিলেন করবেট বাঘিনীকে, তার কাছেই বাঁ দিকে চরছিল ছাগলগুলো। জায়গাটায় পৌঁছে দেখলেন তিনি, একটা গুহার কাছে মরে পড়ে আছে তিনটে ছাগল। দশ পনরটা ছেলে ওই গুহার কাছে ছাগল চরাচ্ছিল। হঠাৎ বাঘটা সেখানে উদয় হয়ে পর পর ছ'টা ছাগলকে মেরে ফেলে। বাঘ দেখেই চেঁচাতে শুরু করে ছেলেগুলো। কাছাকাছিই কাঠকুটো কুড়াচ্ছিল কয়েকজন লোক, তারাও সে চিৎকারে অংশ গ্রহণ করে। লোকজনের চেঁচামেচিতে বাঘটা সরে পড়তেই তিনটে মরা ছাগল নিয়ে দৌড়ে গ্রামে চলে আসে লোকজন আর ছেলের দল। বাকি তিনটা পড়ে থাকে গুহার কাছেই।

করবেটেরও দৃঢ় বিশ্বাস, ছাগল মারা বাঘটা মানুষখেকোটাই। ভোরে গাঁয়ে ফেরার সময় ক্যাম্প পর্যন্ত বাঘিনীর পায়ের ছাপ দেখেছেন তিনি। গতরাতে তাঁবুর বাইরে বসে আগুন পোয়াচ্ছিল আর গল্প করছিল তার লোকেরা। তাঁর ফেরার ঘন্টাখানেক আগে কাকর ডেকে ওঠায় তিনি ফিরে আসছেন মনে করে আগুনটা উস্কে দেয় ওরা, কথাটা ওদের কাছেই শুনেছিলেন করবেট। আগুনটা উস্কে দিয়ে কতবড় বাঁচা বেঁচে গেছে তা ওরা এখনও জানে না, কারণ কথাটা বলেননি করবেট তাদেরকে। গত রাতে মানুষ শিকারের

আশায় ক্যাম্প পর্যন্ত গিয়েছিল বাঘিনী, কিন্তু আগুনের ভয়ে কাছে যেতে পারেনি। মানুষ না পেয়ে এখানেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে ছিল সে, এবং খাবার জোগাড়ের প্রথম সুযোগটারই সদ্ব্যবহার করেছে।

চারদিকে তাকিয়ে আন্দাজ করলেন করবেট, নিচের ঘন জঙ্গলের দিকেই গেছে বাঘিনী। ওই জঙ্গলটা করবেটের অচেনা। ওটা সম্পর্কে দুঙ্গার সিং-এর কাছে খোঁজ খবর নিচ্ছেন তিনি, এমন সময় একটা কালেগে ডাকতে শুরু করল। বাঁয়ে পাহাড়ের ওপর থেকেই বোধহয় ডাকছে পাখীটা। খাড়া উঠে গেছে ওদিকে পাহাড়টা। কয়েকটা ছোটখাট ঝোপ আর গাছ জন্মেছে পাহাড়ের মাথায়। আরেকবার পাখী ডেকে উঠতেই দুঙ্গার সিং জানাল, আসলে পাহাড়ের ওপর থেকে নয়, ওপাশের নালার ধারের কোন গাছে বসে ডাকছে পাখীটা। পাহাড়ের ওপাশে থাকলে তাদেরকে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছে না পাখীটা, তাহলে তার ডাকার একমাত্র কারণ বাঘিনী। দুঙ্গার সিংকে এক দৌড়ে গ্রামে ফিরে যেতে বললেন করবেট। ও গ্রামে না পৌঁছা পর্যন্ত রাইফেল হাতে তার পেছনটায় পাহারা দিলেন তিনি, তারপর ছাগলগুলোর ওপর বসে পাহারা দেবার জন্যে একটা সুবিধামত জায়গা খুঁজতে লাগলেন। উপত্যকার এদিকটায় বিশাল সব পাইন গাছ ছাড়া আর কোন গাছ নেই। মাটি থেকে তাদের প্রথম ডালটির উচ্চতাই কম করে ত্রিশ ফুট। কাজেই ওতে চড়া যাবে না, দিনের বেলা

মাটিতে বসতে অসুবিধা নেই, কিন্তু রাত হলেই মুস্কিল। রাতের প্রথম দিকে আজ কয়েক ঘণ্টা অন্ধকার থাকার পর চাঁদ উঠবে। এই অন্ধকার সময়টুকুতে তখন পুরোপুরি ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে করবেটকে।

খাদের কাছাকাছি একটা বড় চ্যাটালো পাথর পড়ে আছে, ওটার কাছেই আরেকটা ছোট পাথর। ছোট পাথরটায় বসলে বড় পাথরটার আড়ালে থাকা যাবে। যে দিক থেকে আসবে বলে আশা করছেন করবেট, সেদিক থেকে আসলে শুধু করবেটের মাথাটা নজরে পড়বে বাঘিনীর। সুতরাং ওখানে বসাই ঠিক করলেন করবেট। তাহলে তাঁর সামনে থাকবে চল্লিশ গজ চওড়া খাদটার উল্টোদিকের কুড়ি ফুট উঁচু পাড়। পাড়ের ওপর বিশ গজের মত সমতল জায়গার পেছন থেকে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়টা।

পাখীটা আর ডাকছে না এখন। এগিয়ে গিয়ে পাথরটার ওপর উঠে বসলেন করবেট। হাত ঘড়িতে দেখলেন, বেলা দুটো বাজে। আধঘণ্টা পর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে গুহার পাড়ে বসল একজোড়া হিমালয়ের ম্যাগপাই। অপূর্ব সুন্দর এই মাংশাসী পাখীগুলো মড়ার গন্ধ পেলেই ঠিক সেখানে গিয়ে হাজির হবে। কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে মরা ছাগলগুলোর দিকে খুব সাবধানে এগিয়ে গেল ওরা। বার কয়েক হুঁশিয়ারী ডাক ডেকেই বাঘিনীর থাবার আঘাতে পিঠের চামড়া ছড়ে যাওয়া ছাগলটার ওপর বসে মাংস খেতে শুরু করল পাখীটা। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই করবেটের

মাথার ওপরের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল একটা গলা ছেলা ধাড়ী শকুন। ম্যাগপাইগুলোকে মরা ছাগলের পিঠে বসতে দেখেই আস্তে করে নেমে এসে কাছেই একটা পাইন গাছের মরা ডালে বসল শকুনটা। শকুনদের ভেতর এই ধাড়ী শকুনেরাই সবচেয়ে আগে মড়ার খোঁজ পায়। শকুনটা আসায় প্রয়োজনীয় খবরটা পেয়ে গেলেন করবেট। পাইনের উঁচু ডালে বসে আশপাশের অনেকখানি জায়গা নজরে পড়ছে শকুনটার। বাঘটা যদি তার চোখে না পড়ত তা-হলে পাইনের ডালে না বসে প্রথমেই ছাগলের লাশ-গুলোর কাছে নেমে এসে ম্যাগপাইগুলোর সাথে ভোজনে যোগ দিত সে।

পরবর্তী আধঘণ্টা এই দৃশ্যটার কোন পরিবর্তন ঘটল না। অনেকক্ষণ থেকেই মেঘ জমতে শুরু করেছিল আকাশে, হঠাৎ কালো মেঘে ঢেকে ফেলল সূর্যটা। এই সময় আবার ডাকতে শুরু করল কালেগে পাখীটা। সাথে সাথেই চেঁচিয়ে উঠে উপত্যকা বরাবর উড়ে চলে গেল ম্যাগপাই দুটো। আসছে বাঘিনী। ছোটখাট কয়েকটা ঝোপ চোখের সামনে বাধা সৃষ্টি করে রাখায় নালাটা নজরে পড়ছে না করবেটের।

একটু পরই ঝোপের মধ্যে থেকে উঁকি দিল বাঘিনী। করবেটের দিকে চোখ রেখে খাদের ওপারের সমতল জমিটা দিয়ে অতি ধীরে এগিয়ে আসছে সে। মাথার হ্যাটটা চোখের ওপর পর্যন্ত নামিয়ে রেখেছেন করবেট, কাজেই

তাঁর হ্যাট পরা মাথাটাকে পাহাড়ের একটা অংশ বলেই ভাবছে বাঘিনী, এবং করবেট স্থির হয়ে বসে থাকলে কোন সন্দেহ করবে না সে। রাইফেলটা হাতের কাছেই পাথরের ওপর রেখে আনড় বসে রইলেন করবেট। আর একটু-খানি এগিয়ে করবেট আর ওর মাঝের একটা পাইন গাছের আড়ালে বসে পড়ল বাঘিনী। গাছটার একদিকে তার মাথার কিছুটা, অন্যদিকে লেজসহ পেছনের খানিকটা অংশ চোখে পড়ছে এখান থেকে। কয়েক মিনিট সেখানেই বসে বসে কাঁধের ঘা থেকে বিরক্তির সাথে মাছি তাড়াবার চেষ্টা করল সে। ষাট গজ দূর থেকে তার মাথার ওই সামান্য অংশে সঠিক ভাবে গুলি লাগাবার নিশ্চয়তা না থাকায় অপেক্ষা করতে থাকলেন করবেট। আরও কয়েক মিনিট বসে থাকার পর উঠে দাঁড়াল বাঘিনী। তিন পা এগিয়ে এসে, পাশ ফিরে ছাগলের লাশগুলোর দিকে তাকাল। চ্যাটালো পাথরটায় কনুই রেখে তার হৃৎপিণ্ড সই করে গুলি চালালেন করবেট। পেছনের পাহাড়ে বুলেট লেগে খানিকটা ধুলো উড়ে যেতে দেখা গেল। তবে কি লাগেনি গুলিটা? কিন্তু এত সহজ টার্গেট তো মিস হবার কথা নয়! রাইফেলের শব্দ হবার সাথে সাথে লাফ দিল বাঘিনী, আতঙ্কিত পদক্ষেপে ছুটে গেল সমতল জমিটার ওপর দিয়ে। করবেট দ্বিতীয়বার গুলি করার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের ওপারে।

এত সহজ টার্গেট মিস করায় নিজের ওপর দারুণ ক্ষেপে

গেলেন করবেট। পাথরটা থেকে লাফিয়ে নেমেই দৌড় দিলেন। খাদ পেরিয়ে, কুড়ি ফুট উঁচু পাড়ের ওপরের সমতল দিয়ে ছুটলেন বাঘিনী যেদিকে অদৃশ্য হয়েছে সে-দিকে। কতগুলো আলগা পাথরের পর খাড়া ভাবে প্রায় চল্লিশ ফুট নেমে গেছে ওখানে পাহাড়টা। পাথরগুলোর ওপর থেকে একলাফে চল্লিশ ফুট নিচে গিয়ে পড়েছে বাঘিনী, করবেটও তাই করতে গেলে গোড়ালী দুটো ভেঙে যাবে তাঁর। অতএব বসে পড়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে নিচে নেমে এলেন তিনি। খাড়াই এর নিচেই একটা পায়ে চলা পথ। এ পথ দিয়েই গেছে বাঘিনী, কিন্তু পাথুরে পথে তার পায়ের ছাপ পড়েনি। ডান দিকে নুড়ি ভর্তি একটা ছোট্ট নদী। নদীর ওপার থেকে খাড়া উঠে গেছে ঘাসে ঢাকা পাহাড়। পাহাড়ের বাঁ দিকে জঙ্গলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা পাইন। নদী পেরিয়ে পঞ্চাশ গজের মত উঠে যাবার পর প্রথম সঙ্কেত জানাল একটা ঘুরাল। ডানের পাহাড়ের ওপর থেকেই ডাকছে ঘুরালটা। নদী পেরিয়ে ঐ ঘাসে ঢাকা পাহাড়েই উঠে গেছে বাঘিনী। এই সময় বহু লোকের সমবেত চিৎকারে ঘুরে দাঁড়ালেন করবেট। দূরে পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে একদল লোক, তিনি ফিরে চাইতেই হাত নেড়ে এগিয়ে যেতে বলল ওরা। সাথে সাথেই দৌড় দিলেন করবেট। একটা মোড় ঘুরতেই পথের ওপর তাজা রক্ত পড়ে থাকতে দেখলেন তিনি।

খুব ঢিলে হয় বাঘের চামড়া। গুলি খাবার পর যদি

দ্রুত ছুটতে থাকে বাঘ তাহলে তার চামড়া আর মাংসের ফুটো এক জায়গায় থাকে না, তাই রক্তও খুব একটা বেরোতে পারে না। চলার গতি মন্থর হয়ে আসলেই চামড়া আর মাংসের ফুটো এক সরলরেখায় এসে যায়, এবং ঠিকমত রক্ত ঝরতে শুরু করে। রক্ত দেখে একটা জিনিস পরিষ্কার হল গুলিটা একেবারে মিস করেননি করবেট, তবে বোধহয় তেমন মারাত্মক ভাবে আহত হয়নি বাঘিনী।

রক্তের দাগ অনুসরণ করে চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিলেন করবেট। একটু যাবার পরই পথের বাঁ দিক থেকে একটা পাথর বেরিয়ে থাকতে দেখা গেল। পাথরটার কাছ থেকে উত্তর দিকে তীক্ষ্ণ মোড় নিয়েছে পথটা। তীক্ষ্ণ বাঁকটার একেবারে সামনে একটা পনের ফুট খাড়াই। একটা রডোডেনড্রনের ছোট চারা জন্মে আছে খাড়াইটার গোড়ায়, তার নিচেই বিশাল খাদ। অন্ধকার ভয়ঙ্কর চেহারায় খাদটার বহু নিচ থেকে বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা পাহাড়ী নদী। চলার বেগ সামলাতে না পারায় সোজা ওই খাড়াই এর ধারে পৌঁছে ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পড়ে যেতে থাকলেন করবেট। বিপজ্জনক দ্রুত গতিতে গড়িয়ে পড়তে পড়তে ডান হাতে থাবা মেরে ধরে ফেললেন রডোডেনড্রনের চারাটা। সাংঘাতিক ভাবে বেঁকে গেল ওটা। অবস্থা দেখে মনে হল এখনই শেকড়শুদ্ধ উপড়ে আসবে চারাটা। তখনও বাঁ হাত থেকে রাইফেলটা ছাড়েননি করবেট। এক হাতেই ঝুলে থাকতে থাকতে প্রার্থনা করতে লাগলেন তিনি,

'ঈশ্বর, যেন উপড়ে না আসে চারাটা!' বাঁ হাতটা তুলে মাথার ওপরের ছোট্ট চাতালের ওপর রাখলেন তিনি রাইফেলটা। এখন দুটো হাতই ব্যবহার করা যাবে। ডান হাতে রডোডেনড্রনের গোড়াটা ধরে রেখে বাঁ হাতের আঙ্গুল বাধিয়ে দিলেন চাতালের কানিশে। তারপর হাঁটু আর পায়ের সাহায্যে সার্কাসের লোকের মত কসরত করে করে উঠে এলেন চাতালের ওপরে। চাতালে বসে একটু বিশ্রাম নিয়েই উঠে দাঁড়ালেন আবার। চাতালের কাছ থেকে শুরু করে পাহাড়ের ওপর পর্যন্ত খাড়াইয়ের গা থেকে ঠেলে বেরিয়ে আছে কয়েকটা পাথর। এই পাথরগুলোর সাহায্যেই হাত আর পায়ের আঙ্গুলগুলোকে প্রচুর কষ্ট দিয়ে উঠে এলেন যেখান থেকে পড়ে গিয়েছিলেন সেখানে।

রক্তের দাগ ধরে ধরে এখন সহজেই অনুসরণ করে চললেন করবেট বাঘিনীকে। চলতে চলতে একটু পরেই প্রবেশ করলেন ঘন বনের ভেতর। বন পেরিয়ে পাহাড়ের উত্তর ধার ধরে পশ্চিমে চলে গেছে পথটা। এ পথ ধরে আরও দু'শ গজ এগোবার পর পাহাড়ের ওপরের একটা সমতলে এসে পৌঁছুলেন তিনি। পাতাবাহার আর অন্যান্য আগাছার জঙ্গল হয়ে আছে সমতল জায়গাটায়। নিশ্চয়ই এর ভেতরই আছে কোথাও মানুষখেকোটা।

অতি সাবধানে সমতলের দিকে এগোতে শুরু করলেন করবেট। গত ক'দিনে বাঘিনীকে দুই দুইবার আহত করেছেন তিনি, আর একটানা অনুসরণ করে এসেছেন। সুতরাং

করবেটকে এখন চিনে গেছে বাঘিনী। সুযোগ পাওয়া মাত্র প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না সে। কাজেই ভয়ানক বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করার আগে রাইফেলটা আর বুলেট-গুলো ঠিক আছে কিনা আরেকবার দেখে নেবার প্রয়োজন বোধ করলেন তিনি। ক'টা গুলি আছে দেখার জন্যে পকেটে হাত দিয়েই বিমূঢ় হয়ে গেলেন তিনি, কোন গুলি ঠেকছে না হাতে। তাড়াতাড়ি জামা আর প্যান্টের সমস্ত পকেটগুলো খুঁজে দেখলেন, নেই একটা বুলেটও। এতক্ষণে মনে পড়ল, সকাল বেলা নালার পানিতে শার্ট প্যান্ট ধোয়ার আগে বুলেটগুলো পকেট থেকে বের করে রেখেছিলেন তিনি নালার পাড়ে, আর ওগুলো কুড়িয়ে নেয়া হয়নি। শুধু রাইফেলটায় যে দু'টো বুলেট পোরা ছিল তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন বোকার মত। ইতিমধ্যেই দু'টো গুলির একটা খরচ করে ফেলেছেন, বাকি একটার ওপরই যা ভরসা। ফিরে গিয়ে গুলি আনতে হলে আজও হাত ছাড়া হয়ে যাবে বাঘিনী। অতএব ওই একটা গুলি আর ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে এগিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন করবেট। বোল্টটা টেনে টুনে দেখে নিলেন, চেম্বারের অবশিষ্ট বুলেটটা বের করে হাতের তালুতে রেখে তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করে নিয়ে আবার ওটা ঢুকিয়ে দিলেন চেম্বারে। এখন প্রয়োজনের সময় ম্যান্টন কোম্পানীর তৈরি বুলেট নিরাশ না করলেই হল।

ভাগ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়ে আস্তে আস্তে এগুতে

শুরু করলেন করবেট। বুক সমান উঁচু পাতাবাহারের ঝোপের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে পথটা। গাছগুলো এখানে অত্যন্ত ঘন হয়ে জন্মেছে। এই পথ ধরেই পাতাবাহারের ঝোপের মধ্যে চলে গেছে বাঘিনী, পথের ওপর পড়ে থাকা রক্তের ফোঁটাগুলো তাই সাক্ষ্য দেয়। প্রতি এক ফুট পর পর থেমে দাঁড়িয়ে সামনের গজখানেক দেখে নিতে থাকলেন তিনি। এখন সোজা সামনের দিকে চেয়েই হাঁটতে হবে, দু'পাশটা দেখতে হবে চোখের কোণ দিয়ে। কোনদিকেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখা এখন উচিত হবে না। ঝোপের ভেতর মাত্র তিন গজ এগোনোর পরই, ডানে একগজ দূরে নড়াচড়া টের পেলেন করবেট। পরমুহূর্তে দেখতে পেলেন বাঘিনীকে। মাটিতে শুয়ে পড়ে সে ঝাঁপ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় বাঘিনীর ঘাড়ের সাথে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত নিরাশ করল না ম্যান্টন কোম্পানী।

ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলেন করবেট, পাহাড়ের মাথায় তেমনি দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের লোকেরা। মাথা থেকে হ্যাটটা তুলে ওদের উদ্দেশ্যে নাড়াতেই উল্লসিত চিৎকার দিতে দিতে দল বেঁধে ছুটে এল ওরা।

ক্যাম্পে ফিরে এসে পেট ভরে খেয়ে নিয়ে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিলেন করবেট। তারপর চারপাশের ভিড়ের মধ্যে বসে ছাল ছাড়াবার আগে ভালমত দেখে নিলেন বাঘিনীকে। যা সন্দেহ করেছিলেন তাই। তুকার মানুষখেকো বাঘ মারতে

গিয়ে শালবনে বসে দেখা বাচ্চা দুটোর মা-ই এই বাঘিনীটা। বেশ কয়েক বছর পরও তার হারানো গরুকে দেখলে চিনতে পারেন কোন কোন গরুর মালিক। সেরকমই বাঘ চেনার ক্ষমতা ছিল করবেটের। সেই ছেলেবেলা থেকেই বাঘের পেছনে পেছনে ঘুরে ওদের দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত এমন হয়েছিল যে, একটি বাঘ থেকে আর একটা বাঘকে আলাদা করে সহজেই চিনতে পারতেন তিনি। মারা পড়ার আট বৎসর আগে যখন বাঘিনীর বাচ্চা জন্মেছিল, তখন কোন শজারুর সাথে লাগতে গিয়ে মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছিল সে—চামড়া ছাড়াতে গিয়ে তার ডান পা আর কাঁধের মাংস থেকে প্রায় ছ'ইঞ্চি লম্বা বিশটা শজারুর কাঁটা খুঁজে পেয়েই এ সিদ্ধান্তে পৌছলেন করবেট। আহত অবস্থায় তখন স্বাভাবিক খাদ্য জোগাড়ে অক্ষম হয়ে পড়ে সে, আর তাই নিজের আর বাচ্চাদের পেট ভরাবার জন্যে সবচেয়ে সহজ শিকার মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বাঘিনীর দিকে ছোঁড়া করবেটের মোট পাঁচটা বুলেটের তিনটা লেগেছে ওর গায়ে। প্রথম গুলিটা ডান কাঁধের হাড়ের জোড়ায় শক্ত ভাবে আটকে গেছে, দ্বিতীয় আর তৃতীয়টা একেবারেই লাগেনি, চতুর্থটা হৃৎপিণ্ডের একটু নিচে বুকের কাছটা এ-ফোঁড় ও ফোঁড় করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে এবং পঞ্চম ও শেষ গুলিটায় ঘাড়ের ভারটেব্রা ভেঙে গেছে বাঘিনীর।

তল্লাকোটের লোকেদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে আরও তিনদিন সে গাঁয়ে থাকার পর নৈনিতাল ফিরে এলেন

করবেট। নৈনিতাল পৌছার সপ্তাহ খানেক পর তাঁর বন্ধু স্যার ম্যালকম হোম, কর্ণেল ডিক নামে একজন কর্ণ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে গেলেন করবেটকে। লাহোর হাসপাতালে রেখে একটানা তিন মাস চিকিৎসা করার পর করবেটের বাঁ কানটাকে আবার ঠিক করে দিলেন কর্ণেল। মনে মনে বার বার ধন্যবাদ জানালেন করবেট ঈশ্বরকে। কারণ দু'কান ভরে আবার শুনতে পাবেন তিনি পাহাড়ী পাখীর গান।

দাঁড়াও পাঠকবর,জন্ম যদি তব এই বঙ্গে

এসেছে নতুন বছর,২০১১ সালের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছি আমরা। অনেক আশা নিয়ে অত্যন্ত সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে এই লাইব্রেরিটি গড়ে তোলার প্রয়াস,আজ বর্ষশেষের পরিক্রমায় বলতেই হবে যে লক্ষ্য অনেকাংশেই সফল। দেশে বিদেশে আজ শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাদেও সক্রিয়তাই আমাকে নিত্যনতুন বাধাবিঘ্ন পার হয়েও সাইটটিতে নতুন নতুন বই আপডেট করায় নিয়োজিত রেখেছে।

যারা এ্যাড ব্রাউজ করে আমাকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করছেন,তাদের প্রতি আবারো কৃতজ্ঞতা রইল। আবারও বলছি,যারা বাংলাদেশে থাকেন,তাদের এই কাজে অংশ নেওয়ার দরকার নেই। যারা প্রবাসী,তাদের কাছে অনুরোধ রইল আর একটু বেশী সময় ধরে ব্রাউজ করতে। সম্ভব হলে ভিন্ন আইপি থেকে ব্রাউজ করতে পারেন।

আপনাদের পছন্দের বইটি পেতে চাইলে চ্যাট বক্সে বা আমাকে সরাসরি মেইল করতে পারেন ayan.00.84@gmail.com এ। আমার শহরে বইয়ের প্রাপ্তি সাপেক্ষে আপনাদের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করব। আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে যারা এ সাইটের কথা জানেন না,তাদেরকে রেফার করতে পারেন। এছাড়া শীঘ্রই ফেসবুকে একটি পেজ খোলার চিন্তা করছি,যেখানে আপনারা সংযুক্ত থাকতে পারবেন।

মূলত এখনও পর্যন্ত ওয়েবে অপ্রাপ্য বইগুলিই এখানে দেওয়ার চিন্তা আছে,তাই কোন বই আপনি সাজেষ্ট করার আগে বিভিন্ন ফোরাম ঘুরে দেখে নিন সেখানে বইটি আছে কিনা।

বর্তমানে মূলত ভারতীয় লেখকদের লেখাই প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে,পরবর্তীতে বাংলাদেশী লেখকদের লেখাও আনা হবে।

এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে লেখক,প্রকাশকদের কোনওভাবে ক্ষতি হোক তা আমরা চাই না,তাই কোন বই আপনার ভাল লাগলে তার হার্ডকপিটা বাজার থেকে কেনার চেষ্টা করুন,প্রিয়জনকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বই উপহার দিন। আর বেশী বেশী করে বাংলা বই পড়ুন। আপনাদের জীবন বইয়ের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠুক,এই কামনায় নতুন বছরের শুভেচ্ছা আরও একবার জানিয়ে শেষ করলাম।

মোবাইলঃ 8801734555541
8801920393900